অনির্বাণের জন্য বিষাদগাথা

শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অঙ্কন : শান্তনু দে

অনির্বাণের জন্য বিষাদগাথা

শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অঙ্কন : শান্তনু দে

হাসপাতালের সাদাটে আলোর সঙ্গে জানলা খোলা সকাল ১০.৩০ যখন হলুদ প্রাণবন্ত স্পিরিট গুঁজে দিচ্ছে এই কেবিনে, গত রাতের কালচে ছোরাগুলো যেন কোথায় উধাও—তখন অনির্বাণের মনে পড়ছে প্রথমবার নদী দেখার স্মৃতি। এই কেবিনে জানলা থেকে চোখ নামালেই নিজের অস্থি ক্যানসারে বাদ যাওয়া ডান পা আর বাইরে চোখ পাঠালেই আর কোনও অসুখ নেই, শুধু তীব্র সংজ্ঞানাশক ওষুধের অসাড়ে সুন্দর প্রথম নদী দেখার স্মৃতি। কী উদাত্ত সে পরিবেশ, ছোট্ট অনির্বাণ চলেছে বাবার হাত ধরে, সে জানেও না নদী কী, আর যখন উপস্থিত হল সামনে, সেই বিরাট ঘোলাটে সাপের সামনে—আর কোনও দিকজ্ঞান নেই শুধু বারবার জলের সঙ্গে মাটির সঙ্ঘর্ষের শব্দ শুধু মাটির জলে মিশে যাওয়ার শব্দ—দূর আরও দূরে একটা নৌকা—বাবা বলল, মাছ ধরা নৌকা—আর পাশে চোখ ফেরালে এই বিরাট ধূসর স্রোতে এই শব্দের বিশালতার শরীরে আলতো করে হলুদ মিশিয়ে দিচ্ছে আর একটা নদী—রংটা কি গাঢ় হলুদ ছিল? এখন তো তাই মনে হচ্ছে গাঢ় হলুদ রঙের একটা অ্যাক্রিলিক প্রবাহ এসে মিশে যাচ্ছে ধূসর জলরঙের শরীরে। আর সময়টা কী অপূর্ব ছিল তখন। একটা স্থির শান্ত পরিবেশে বাড়িতে তখন ঠাকুমা দিদিমা মাসি পিসি কাকা জ্যাঠা চাকরি না পাওয়া দূর সম্পর্কের মামা একসঙ্গে বসে থাকত বিকেলবেলা। চায়ের সঙ্গে মুড়ি। আর তারপর জমে গেল, কারেন্ট না থাকা সন্ধে—কিছুতেই না থামা বৃষ্টি আর ভূতের গল্প। কী কথা কী কথা! তখন তো বাবারা সবে এসেছে সেই ছোট্ট শহরে। শহর? হ্যাঁ তা তো বটেই, একটা পুরনো পুরসভা, তার ইংরেজ আমলের কল, ড্রেন। আর ফাঁকা ফাঁকা। কেন এখানে জনপদ গড়ে উঠেছিল তার পিছনে অনেক জলজ কাহিনি থাকলেও এখন স্থলবদ্ধ শহরে তা বোঝার উপায় নেই। শুধু পুরনো লোকজন আর অনির্বাণের বাবার মতো কয়েকজন ভাগ্যসন্ধানী। আশপাশের গ্রাম থেকে চলে এসেছে। কীই বা ছিল তখন? নভেম্বর মানে রাসের মেলা আর খাজার গন্ধে মাতোয়ারা রাসমাঠের গায়ে তখন সার্কাসের তাঁবু। বাদামভাজা আর অজানা ভাষায় কথা বলে চলেছে জোকার। অনির্বাণ আর সঙ্গে আলোমামা। আলোমামা যে কীরকম মামা সেটা কোনওদিন বোঝা হয়নি—শুধু কখনও রাতে, গভীর রাতে গান ও জলসা শেষ হলে মদে টইটম্বুর বাবা মাকে বলত "আর কতদিন আলো দেখবে ছোটবউ? এবার একটু এই অন্ধকারকেও দেখ।" মার উত্তর শোনা যেত না। শুধু বাবার গলায় খেলত শচীন দেববর্মন। বাবার গানের গলাটা পেয়েছিল সেজদি। সেদিনটাও নভেম্বর ছিল? সেজদি প্রথম রেডিওতে গান গেয়ে ফিরল। বাইরের হিম ও সার্কাস ফেরত বাবা। বাবার শেষ দিকটায় এক আশ্চর্য সার্কাস দেখার নেশা ছিল। কত বয়স তখন? সেজদির ১৯ কী ২০, অনির্বাণের ১৪। সার্কাস ফেরত মাতাল বাবা বসেছে হারমোনিয়াম নিয়ে। পাশে পানের ডিবে। বাবার গলায় আবারও শচীনদেব—তোমার সাথে সুরে পরিচয়—বাবা উদাস হলেই শচীনদেব গাইত। আজ সেজদির ফিরতে দেরি হচ্ছে। বাড়ছে বাবার হারমোনিয়ামের বেলোতে হাতের দ্রুত চলাচল। 'দেখোনি হিয়াতলে কী যে রয়' লাইনটা বারবার গাইছে বাবা। অনির্বাণ ঘর থেকে দেখছে। একটা লম্বাটে দোতলা বাড়ি। মোট ছ'টা ঘর। বাড়ির সামনে উঠোন। সেখানেই রান্নাঘর। আর এক প্রান্তে স্নানঘর। বাবা গাইছে দোতলার বারান্দায়। শ্রোতা মা। ঠাকুমা নিজের ঘরে। অনির্বাণ জানে বিধবা ঠাকুমা বাবার এই মাতাল দশার জন্য নিজের স্বামীকে প্রবল খিস্তি দিচ্ছে আর আফিম গুলি খাচ্ছে। পাশে পাথরের টেবিলে পাথরের গ্লাস, তাতে দুধ। অনির্বাণ বাবার এই উন্মত্ত দশার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে না পেরে ঢুকে পড়েছে ঠাকুমার ঘরে। কিন্তু ছোটবেলার সখ্য তো আর নেই। ঠাকুমা বলে "দেখ বাপটাকে দেখ, কোনওদিন তানপুরো নিবি না। বলেছিলুম রাণুকে গান শেখানোর দরকার নেই কিন্তু কে শোনে কার কথা!" অনির্বাণ চুপ করে থাকে। জানে যে ঠাকুমা ঠাকুরদার মৃত্যুর পিছনে গানকে দায়ী করে। সত্যিই তো গান গান আর জলসা আর মদ লোকটা তো এমনি মরেনি! কী আছে সুরের দেহে, স্বরলিপির গায়ে? কয়েকদিন আগে অনির্বাণ ওর ক্লাসের রঞ্জিতকে নিয়ে গিয়েছিল জমিদার বাড়ির আমবাগানে। কী আশ্চর্য পুজোর ঠিক আগেকার ঝলমলে অক্টোবর। আমবাগান বোলহীন, পরিষ্কার। এক কোণে পাহাড়ের গোপন শরীরের মতো দেখা যাচ্ছে লালচে জমিদার বাড়ি। ওরা এগিয়ে যায় সেই ছায়া ছায়া ইমারতের দিকে। বড় দোতলা বাড়ি। কোনও জানলা নেই। দোতলায় রঙিন কাচ লাগানো দরজার মতো বড় জানলা পাশাপাশি সবক'টা ঘরে। শেষতম আমগাছ আর বাড়িটা কোনও সীমানা মানেনি—গাছ জানলার সঙ্গে মিশে গেছে। ফাঁক দিয়ে ঝকঝকে নীল ফিনফিনে আকাশ। গাছটার তলার দিকে নজর গেল হঠাৎই। ওরা ওপর দিকে তাকিয়ে হাঁটছিল তাই খেয়াল করেনি এতক্ষণ ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা খাতা আর ছাপা বই-এর পাতাগুলোকে। এবার আটকে গেছে পা। স্তূপে। অনির্বাণ নীচু হয়। শুধু স্বরলিপি। যেদিকে চোখ যাচ্ছে শুধু স্বরলিপি। রঞ্জিত বলল, "গত সপ্তাহে গাঙ্গুবাই মারা গিয়েছে। এতদিনের গাইয়ে এ বাড়ির। দেখ মরার পরেই সব কেমন ফেলে দিল।" সেজদি ফিরেছিল অনেক রাতে। স্বাভাবিক। আলোমামা সঙ্গে ছিল। তবুও বাবার সেই অস্থিরতা থামেনি। গান যত বেশি রাগপ্রধান হয়েছে বেড়েছে ঠাকুমার অস্থিরতা। মোটা থলথলে কুৎসিত লোলচর্ম বৃদ্ধা হঠাৎ উঠে নিজের কাঁসার পানের ডিবে ছুড়ে মেরেছিল বাবার দিকে। লাগেনি ডিবেটা। ঘরের দরজায় ধাক্কা মেরে, মেঝেতে বিকট আওয়াজ তুলে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এতে একটাই জিনিস হয়েছিল। গোটা বাড়ি হঠাৎ স্তব্ধ। ফলে যখন সেজদি বাড়ি এল তখন আর কোনও উত্তেজনা বেঁচে নেই। বড়দি মেজদি ঘরে একতলায়। পাশের ঘরে দাদা। হয়তো পড়ছে। তার পাশের ঘরটা আলোমামার। দোতলায় একটা ঘরে বাজনা সহ রেওয়াজের ব্যবস্থা। সঙ্গে অবশ্য একটা খাটও পাতা আছে। কেউ এলে এখানেই অতিথিশালা।

বাবা মা একটা ঘরে। একটা ঘর ঠাকুমার। শীত মানেই একধরনের মজা। ন'টার মধ্যে সবাই কেমন যেন সেঁধিয়ে গিয়েছে। বাইরে কুয়াশা, বাবা বসেছে হারমোনিয়াম নিয়ে, মদ নিয়ে একটানা কীর্তন চলছে। কে সি দে। স্বপন দেখিছে রাধারাণী। স্পন্দন ও বিন্যাস ছড়িয়ে যাচ্ছে শরীরের। বাবা আজ বাংলা খাচ্ছে। গন্ধে ভরে গিয়েছে বারান্দা। ঠাকুমা ঘরের ভিতর থেকে চেঁচিয়ে চলেছে "তুই থামবি এবার? তোর গানের মুখে নুড়ো জ্বেলে দি।" বাবা থামছে না। গন্ধ ও বেসুর একই সঙ্গে ব্যাপিত হচ্ছে বাড়িটায়। "তোর কি মানসম্মান নেই! তুই এই চক্কোত্তি বাড়ির একমাত্তর সলতে। তোর বড় মেয়ের বিয়ে আজ ভেঙে গেল তোর এই মদ আর সার্কাসের জন্য।" বাবা কিছুতেই শুনছে না কিছু। অনির্বাণ তার বড়দা অরিন্দম সবাই জানে ঘটনাটা কী। দিদির সঙ্গে যে ছেলেটার সম্বন্ধ এসেছিল, মানে বিয়ে ঠিক হয়েছিল তার বাবাও নাকি সার্কাসে যায়। কিন্তু সার্কাসে যাওয়ার সঙ্গে বিয়ে ভাঙার কী সম্পর্ক তা বোঝেনি অনির্বাণ। অরিন্দম বলেছিল হয়তো জুয়া খেলে। এ ঘটনা ঘটছে যখন অনির্বাণের ১৬। ঠাকুমার কড়া শাসনে তার আর গান শেখা হয়নি। দাদারও না। মেজদি বড়দি একটু শিখলেও বেশি দূর এগোতে পারেনি। কিন্তু সেজদিকে কেউ আটকাতে পারেনি। এক অদম্য জেদে বাবা ওকে নিয়ে গান শিখিয়েছে। গত দু'বছর সে রেডিওয় গানও গাইছে। কিন্তু এইসব জিনিসই এই ছোট্ট শহরটার চোখে ভয়ঙ্কর। বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। বাড়ছে বাবার মদ খাওয়া বেসুরে গান। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বড়দি পালিয়ে গেল। জুলাই মাসের বৃষ্টি না হওয়া সন্ধে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে হলুদ ধূসর আর সাদা মেশানো আলোয় মা, বড়দা আর আলোমামা ফিরছে থানায় রিপোর্ট করে। বাবা দোতলায় বসে গান গাইছে—আজ হেমন্ত মুখার্জি—জানিতে যদি গো তুমি পাষাণে কী ব্যথা আছে। ভিতরে ঠাকুমা অকথ্য চিৎকার করে চলেছে। অথর্ব ঠাকুমার হাতের কাছ থেকে

মা পানের ডিবেটা সরিয়ে দিয়েছে। তাই বোধহয় কিছু ছুড়তে পারছে না। অনির্বাণ সেদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। সাইকেল নিয়ে দিগ্বিগিক জ্ঞানশূন্য বহুদূর চলে যাওয়া সেই বিকেলে যেখানে উপস্থিত হয়েছিল সেটাকে বোধহয় হালকা সবুজ একটা বিরাট চাদর বললে কম বলা হবে না। যতদূর চোখ যাচ্ছে সদ্য গজানো দানাশস্যের চারা বিকেলের না বৃষ্টি আলোয় মিশে হালকা ঢেউ, হাওয়া তৈরি করছে যেন। বড়দি পরে এক মুসলমান ছেলেকে নিয়ে ফিরেছিল। ছ'মাস পর। আনিসুরদা। রাজমিস্ত্রি। বাবা একটাই প্রশ্ন করেছিল বা বিস্ময় জানিয়েছিল "এ তো গান জানে না রে মা!" বড়দি বলেছিল, "হ্যাঁ জানে বাবা। ও খুব সুন্দর ছাদ পেটার গান গায়।" ঠাকুমার অজস্র গালাগালি ও ক্রন্দনধ্বনিকে সেদিন অতিক্রম করেছিল "দালান দিলি মহল দিলি বাড়ির নীচে....পুষ্করিণী একখানা পানসি দিতে পারোনি।" বাবা সেদিন হুইস্কি এনেছিল। যদিও আনিসুরদা তা ছোঁয়নি কিন্তু বাবা পরিপূর্ণ পান করে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ধরেছিল 'ঝির ঝির ঝির ঝির ঝিরি বরষায় হায় কি গো ভরসা আমার ভাঙা ঘরে তুমি বিনে'। এরপর বড়দি আবার ফিরেছিল দেড় বছর পর। কোলে বাচ্চা। আনিসুরদার একটা সাদা-কালো ছবি। মারা গিয়েছে। সাপের কামড়ে। অবিবাহিতা মেজদি আর সেজদির সঙ্গে আবার জুড়ে যাওয়া বড়দি—এই ঘটনার একটাই ব্যঞ্জনা। বড়দাকে কাজ খুঁজতে হবে। বড়দার কলেজ তখন শেষের দিকে। আর ঠাকুরদার চেনাশোনার গণ্ডিটা বড় থাকায় বড়দার কাজ জোটাতে অসুবিধা না হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিশোর অনির্বাণের জীবনে প্রকৃতই বয়সের সন্ধি ঘটে এই সময়। গোটা দুনিয়াতেই যেমন যে কোনও গুমোট দশা কাটিয়ে দেয় একঝলক মাংসল ছোঁয়া, এখানেও তেমনটাই ঘটল। ১৭ বছরের নাতি-কিশোর অনির্বাণ তখন বাড়িতে ঢুকছিল তার প্রতিদিনের বৈকালিক ভ্রমণ সেরে—বাইরে নভেম্বর, আস্তে আস্তে অন্ধকার গিলে নিচ্ছে বাড়ির সামনের নিমগাছটাকে—একটু পরে অভ্যস্ত দুটো পেঁচার মিলনডাক শোনা যাবে—উপরের বারান্দায় নিশ্চল বাবা অন্ধ ভিখারি যেভাবে আর একজন অন্ধকে ছুঁয়ে থাকে সেভাবে, নির্ভরশীলতায়, ছুয়ে হারমোনিয়াম (অনির্বাণ নিশ্চিত) গলা পাওয়া যাচ্ছে—বেসুরে শচীনদেব। সে সাইকেলটা রাখে বারান্দার পাশে, অভ্যেসে। প্রায় কোনও আওয়াজ হয় না। কিন্তু এক অজানা-অচেনা শব্দ কানে আটকে যায় অনির্বাণের। বড়দি মেজদি সেজদির ঘর থেকে আসছে আওয়াজটা। এক অদ্ভুত গোঙানির আওয়াজ। মহিলা কণ্ঠ। অনির্বাণ এগিয়ে যায়। দ্রুত। দরজা বন্ধ। জানলাটাও বন্ধ। কাছে আসতে আওয়াজ আরও স্পষ্ট। কিন্তু এ গোঙানি তো কেমন আনন্দের মনে হচ্ছে। দরজায় কান পাতে অনির্বাণ। 'এভাবে নয়', 'আস্তে আস্তে', 'তুই এত নরম', 'আহ', 'আহ।" "আরে এ তো আলোমামার গলা" অনির্বাণ আরও কান খাড়া করে। একই পুনরাবৃত্তিমূলক শব্দগুচ্ছ। এবার সে জানলার কাছে আসে। আলতো টোকা মারতেই টের পায় জানলায় ছিটকিনি দেওয়া নেই। কী মনে করে সে সামান্যই ফাঁক করে। বিছানায় সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা সেজদি। আলোমামার অঙ্কশায়িনী। টকটকে লাল মুখে বন্ধ চোখে আছড়ে পড়ছে আলোমামার মুখ। বেরিয়ে আসছে সেইসব পুনরাবৃত্তির শব্দ।

দুই

রাস্তাটাকে নম্র বলে ডাকা যায়। একটা ছোট্ট ৪ কিলোমিটার লম্বা শহরের শিরদাঁড়া এই রাস্তাটা সোজা একটানা তিন কিমি চলে গিয়েছে। শুধু এ অঞ্চলের দৃষ্টিসীমা কম বলে দেখা যায় না। ওপর থেকে দেখলে বোঝা যেত একটা ধূসর মাছের শরীরে বিরাট একটা মেরুদণ্ড। ধূসরতর। গা ঘেঁষে আস্তে আস্তে আঁশের মতো গাছ বাড়ি বসতি। আর তাদের গা ঘেঁষে চলে গিয়েছে সরু সরু গলি—দুটো আঁশের মধ্যবর্তী কালচে সুতো। তবে কোথাও গিয়ে এই ঠাসবুনোট ভাঙে। রুগ্ণ মীন শরীরে যেমন আঁশ খসে যায়—হয়তো যা, অথবা গভীর ক্ষত—তেমনই এই লম্বাটে শহরের গায়ে তৈরি হতে শুরু করেছে বাড়ি ঘর, নতুন। আর সেরকমই একটা এলাকা দিয়ে চলতে গিয়ে অনির্বাণের মনে হল এইসব কথাগুলো—শহরটা একটা রুগ্ণ মীন শরীর। এই জুন মাসের তীক্ষ্ণতায় যখন বাড়ির অবস্থা আরও খারাপ—বড়দি মেজদির ঝগড়ায় কান পাতা মুশকিল, সেজদি আর আলোমামার ব্যাপারটা সবাই জেনে গেছে অথচ কেউ কিছু বলছে না শুধু বাবার নেশার মাত্রা বেড়ে গেলে বড়দি চিৎকার করে ওঠে।

সারাবছর ঋতুহীন বাড়িটায় শচীনদেব বর্মন ক্রমশ বেসুরো হয়ে উঠেছে। সেজদি অদ্ভুত কারণে শুধু শ্যামাসঙ্গীত গায় আজকাল। রেডিওয় ওকে অজুত নতুন গীতিকারের লেখা শ্যামাগান গাইয়ে নেওয়া হয় অথচ সেজদি অন্য কোনও গান গায় না। রেওয়াজে বসলেই বাবা কেমন যেন হয়ে যায়। অতি ঘোর নেশাড়ু চোখে চেয়ে থাকে—সেজদি প্রথমে ধরে পান্নালাল ভট্টাচার্যের বিখ্যাত কোনও গান—বেশিরভাগ দিনই মুছিয়ে দে মোর এ দু'টি নয়ন মুছিয়ে দে স্নেহ ভরে। একটু বেশিক্ষণই যেন থামছে আজকাল অস্থায়ীতে, মা গো—বলে টান আসতেই বাবা কেঁদে ফেলছে। ঠাকুমা আজকাল থেমে গেছে। আর সে জায়গা নিয়েছে অবিবাহিতা মেজদি। যে কোনও গানের সময় শোনা যায় সে আওয়াজ করে উঠোনের কলতলায় বাসন মাজছে আর উঠে এলেই নানা খোঁটায় ভরিয়ে দেয় গোটা পরিবারকে। কোথাও যেন একটা বেড়াল লুকিয়ে থাকে—প্রতিদিন এ সময়—সে ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্য এক বেড়ালের ওপরে—শুধু বিকট আওয়াজে সন্ধে থেমে যায়। রোজ। অনির্বাণ আজ বেরিয়ে পড়েছে। সাইকেলের প্যাডেল এক আশ্চর্য স্বাধীনতার বীজ। বাড়ি থেকে বেরনোর সময় চিৎকারের ফাঁকে শুধু মায়ের থমথমে মুখটা একবার দেখে নিয়েছিল সে। মা এখন শুধু একদলা স্তব্ধতা। বড়দা? সেও মদে চুর হয়ে যখন অফিস ফেরত, তখন গোটা বাড়িটাকে দোষ দেওয়া ছাড়া আর কিছু নেই তার মুখে "কাদের জন্য খেটে মরছি? এক বুড়ো মাতাল, যমেও নেয় না।" এবার মায়ের গলা পাওয়া যায় "থাম তুই। আর একবার বললে আমার মরা মুখ দেখবি।" তারপর ঠাকুমা "ও তো ভুল বলেনি।" আবার চুপচাপের ভেলা মা। "এ বুড়িকেও তো যমে ভুলেছে" মেজদি বলে ওঠে। আবার শুরু হয়ে যায় অভিযোগ আর অভিসম্পাতের রোজকার পাশাপাশি অবস্থান। রোজই বেরিয়ে পড়ে অনির্বাণ এই সব সময়ে কখনও সন্ধে কখনও বা রাত বলে মনে হয় ঋতুর ব্যবহারে। আজ এই জুন মাসের সদ্য বৃষ্টি থামা সন্ধের মুখটাকে একটু বেশিই উজ্জ্বল লাগতে শুরু করেছে ঠিক যে মুহূর্তে সাইকেলের প্যাডেলে পা ও বেগের ঘোরে মাথায় এসেছে এই আহত মীনের কথা। কোথায় যাওয়ার কথা? কীভাবে যেন নিজের হাইস্কুলের পাড়ায় এসে পড়েছে। গত দু'বছর আগে যেমন ছিল এখনও অবিকল তেমন। ইশকুল তো শহরের মধ্যেই হয়—কিন্তু এ তেমন নয়, একটেরে, বিচ্ছিন্ন শহরের একেবারে বাইরে। কে যেন, জমিদার বা তার স্ত্রী মনে পড়ছে না, তৈরি করেছিল একে বাইরে। ছেলেদের স্কুল। আর তাতেই কি ছেলেগুলো অমন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল? সদ্য যুবক অনির্বাণ ভাবে? ভেবেই বা কী হয়? তার পড়া বা অন্যান্য জগৎ তো বাড়ির লোকের কাছে অজানা। বড়দা সেদিন সরাসরি বলেই দিল চাকরি খোঁজার কথা। স্কুলটার দিকে এলেই সেই বিকেল রঙের দুপুরটা চোখের সামনে হাজির হয় আর অনির্বাণের সাইকেলের বেগ বেড়ে যায়। যেদিন আলোমামা আর সেজদিকে ওভাবে আবিষ্কার করেছিল তার পরের দিন। সেই দৃশ্যে প্রথমবার নিজের লিঙ্গ বেয়াড়াভাবে শক্ত হয়ে উঠেছিল—রঞ্জিত তার চিরদিনের বন্ধু শুনে বিশ্রী ব্যঙ্গার্থক হাসি দিয়েছিল—"আরে ওরা লাগাচ্ছিল গাণ্ডু তুই এটুকুও বুঝিস না?" পাশে বসেছিল সবিতা —এই ইশকুলের পিছনের মাঠ সংলগ্ন ঝোপের লাগোয়া— অ্যালুমিনিয়াম রঙের দুপুরের স্পর্শে আর শব্দগুলোর অভিঘাতে সে কেমন ঠাণ্ডা ও ফ্যাকাশে, মাথা তুলতে পারছে না। "তুই আর অ্যাডাল্ট হবি না অনি।" মুখ নামানো দু'জনেরই। অনির্বাণ ও সবিতার। শব্দহীন শীতের

জ্যোৎস্নারাতে কলতলায় অ্যালুমিনিয়ামের বাসন। ঠাণ্ডা। আজ অনির্বাণ থেমে যায়। ইশকুল ছাড়িয়ে চলে এসেছে। শহরের পরিধি—তার মীন শরীরের লেজ এই অঞ্চল। চায়ের একটাই দোকান। বিশেদা। কার জন্য এখানে দোকান খুলেছে বিশেদা? বিবিধ ভারতী বাজছে।

লতা মঙ্গেশকর। দিলভিল প্যার....ব্যার। বিনাকা গীতমালা। আমিন সায়ানি। এই শহরে বোধহয় আর কেউ হিন্দি গান শোনে না। কিন্তু বিশেদা? তার বিচ্ছিন্ন দোকানের মতোই বিচ্ছিন্ন অভ্যাস। সামনে দাঁড়াতেই চেনা আওয়াজ—"আজ রঞ্জিত আসবে না।" "কথা ছিল না কি?" "আরে তুই তাহলে এসেছিস কেন?" "এমনি।" "শোন এ বছর লতার এই গানটা পুরস্কার পেল।" "কী গান?" "এই যে দিল-ভিল।" "কে দিল পুরস্কার?" "কেন? রেডিও দিল।" "ও, রেডিও পুরস্কার দেয় বুঝি?" "হ্যাঁ, শোন তুই বাড়ি চলে যা। দিনকাল ভাল নয়। জানিস তো যারা পার্টি করে তাদের পুলিশ ধরছে?" অনির্বাণের শরীরটা কেমন এলিয়ে আসে। পার্টি! রঞ্জিতের হাত ধরেই একদিন পৌঁছেছিল নির্মলদার ডেরায়। আর সেটাই কি তার সাবালকত্বের পাসপোর্ট ছিল না? এই তো গত বছর যখন যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এল সেও কি অনুভব করেনি সেই সেজদিকে ওইভাবে দেখে ফেলার শিহরন? সবিতা রঞ্জিতের মুখের ভাষার কারণে সরে আসছিল একটু? কলেজ ফেরত লোকাল ট্রেনে শুধু সবিতা ছাড়া বাকি সবটা ঝাপসা হয়ে গেছে। পিঠে আলতো চাপড় মেরেছিল—আর সেই প্রথম মাতৃভগ্নি স্পর্শ ছাড়া অন্য মেয়েছোঁয়া। ফিরেই নির্মলদার ঠেক। "তুই কবিতা লিখিস অনির্বাণ তোকেই দায়িত্ব নিতে হবে।" "কী দায়িত্ব নির্মলদা।" "পোস্টার লেখার। পোস্টারের ভাষার।" "আমি...।" "তুই পারবি... পারতে তোকে হবেই।" "কিন্তু...।" "মানুষ স্বাধীন না হলে কবিতা পড়বে?" "আমি অত বুঝি না...।" "বুঝতে হবে। জেনে রাখ পার্টিই স্বাধীনতার শেষ কথা।" সেদিন স্বাধীনতা কবিতা সব পাকিয়ে গিয়েছিল। বেরিয়ে পড়া রাস্তায় শুধু সদ্য ক্ষমতার উচ্ছ্বাস ছিল পুরো দলে—বেরিয়ে এসেছিল শুধু অনির্বাণ আর সবিতা—দু'জনেরই ফেরার তাড়া ছিল। অন্ধকার লোডশেডিং-এর পথে স্বাধীনতার নাম কি সবিতা ছিল? ঘামের শরীরে শুধু স্বেদবিন্দু, স্বেদ স্বেদ এক অবিশ্বাস্য গতির সাইকেলের সামনের রডে বসা সবিতার স্বাধীনতা ধীর লয়ে স্পন্দমান রোগা কলেজ কলিজায় অর্পিত হচ্ছিল, খোঁপার উত্তাপে নারকোল তেলের গন্ধই তো স্বাধীনতা... মাথায় কেন শচীনদেব বর্মন এল? কেন ..... জাগো জাগো? কেন তোমার পথিক এল যে ফিরে লাইনটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসে গিয়েছিল সবিতার বাড়ি? সেখান থেকে নিজের বাড়ি অব্দি আসার মতো দীর্ঘপথ সে আর কখনওই পাড়ি দেয়নি...

তিন

সকালবেলা হয়ে গেছে অথচ বাড়িতে কোনও শব্দ হচ্ছে না। অনির্বাণ উঠে পড়েছে কিন্তু বিছানা থেকে নামছে না। গতকাল অনেক রাত অব্দি লিখেছে সে। গল্প। কলেজ ম্যাগাজিনে যাবে। সারা কলেজ জুড়ে এক আশ্চর্য উন্মাদনা চলছে এখন। হাতে লেখা একটা কাগজ, 'কৃষকজনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বিপ্লবীর পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকর দুর্বলতা'—আর অনেকেই বুঝতে পারছে না কী করা উচিত। অনির্বাণের মতো যারা শহর থেকে দূরে থাকে, যাতায়াত করে তারা আরও অসহায় বোধ করছে। কিন্তু বিশ্বনাথদা, কলেজ পত্রিকার সম্পাদক, অনির্বাণের লেখা কবিতা পড়ে বলেছে এবার একটা গল্প লেখ—তোর পাড়ার গল্প, গ্রামের গল্প। অনির্বাণ কিছুতেই বোঝাতে পারেনি আজীবন শহরবাসী বিশ্বনাথদাকে, সে গ্রামে থাকে না, ছোট শহরেরও একটা নিজস্ব নাগরিকতা আছে। কিন্তু প্রাণীত হয়েছে। লিখে ফেলেছে। চারদিনের পরিশ্রমে—আর গতকাল ছিল তার শেষতম, কঠিনতম দিন। অনেক রাত অব্দি রেকর্ডে বেজেছে নতুন গান চঞ্চল ময়ূরী এ রাত। অনির্বাণের ভাল লাগছিল। সবিতার কথাই তো মনে হয়। লিখে ফেলছিল গল্পের শেষটা যখন নির্মলদার মতো একটা তীব্র কমিউনিস্ট চরিত্র তার প্রেমিকাকে নিয়ে ফসলকাটা খেতের পাশে বসে বলছে এই খেত আমাদের হবে। অনির্বাণ বুঝতে পারছে না কে ঠিক নির্মলদা নাকি বিশ্বনাথদা? নির্মলদা তো ভোটের কথা বলে। বুঝতে পারছে না অনির্বাণ। হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল ঘরের। দাদা সকালের স্কুলে পড়ায়। স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে পড়েছে। অনির্বাণ জানে এখন এই টাইমপিসের গায়ে লেগে থাকা ৭.৪৫ মানে বাইরে রোদের রং পাকা পাতিলেবুর খোসা। দরজায় দাদা। "কী রে ইশকুলে যাসনি?" "ঠাকুমা মারা গেছে।" "মানে?" "কাল রাতেই মারা গেছে। কেউ দেখেনি।" "কখন বুঝলি?" "কী বুঝলাম?" "মানে কখন দেখলি মারা গেছে?" "বড়দি ঘরে চা দিতে ঢুকেছিল। দেখে সদ্য ভরা আফিমের কৌটোটা প্রায় খালি...।" "মানে আফিম বেশি খেয়ে মারা গেছে?" "হতে পারে। আমরা চেপে গেছি। কে আবার পুলিশের ঝামেলায় যাবে। এখন তুই চল শ্মশানে যেতে হবে।" "বাবা?" "শুনতে পাচ্ছিস না?" যেন এতক্ষণ কানে তালা লেগেছিল বা বন্ধ ছিল কাচের দরজা। এখন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে বাবা রেকর্ডের হেমন্ত মুখার্জির সঙ্গে গলা মেলানোর চেষ্টা করছে—যাবার বেলা পিছু থেকে ডাক দিয়ে কেন বল...

শ্মশান মানে তো বাড়ি ফিরে জ্বর। ঘিয়ের গন্ধ। আলো চাল। জানুয়ারি যেখানে তার বৃষ্টি সমেত নরম ঠান্ডা হাত থাবার মতো বসিয়ে দিয়েছে পাজামার নিচে নেতিয়ে থাকা পায়ে সেখান থেকেই বেরিয়ে পড়ার ডাক আসে। কে ডাকে? ঋতুহীন বারান্দায় আলো কমে আসা বিকেল ৪.৩০, বাবা হারমোনিয়ামে কিন্তু গাইছে না। পাশে সেজদি ও আলোমামা। "তোমরা এবার বিয়ে করে নাও আলো। এটা খুব ভাল দেখাচ্ছে না।" কেউ শুনছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। মা স্তব্ধ। এখন ঠাকুমার ঘরে থাকছে। সেজদি বলছে "একটা নতুন রামপ্রসাদী তুলেছি। শুনবে?" আলোমামা বলছে "ওকে ধনঞ্জয় ভট্চায শেখাবে বলছে।" আবার বাবা যেন ধাতস্থ হল "ও আবার কী শেখাবে? আমরা যখন রাইচাঁদ বড়ালের কাছে শিখতুম..." পাশ দিয়ে কেউ চলে গেলেও টের পাবে না এমন অসাড়ে বাবা কথা বলে চলেছে। নেশায় চোখ বন্ধ। অনির্বাণ দোতলায় উঠতে গিয়েও উঠল না। জ্বর গায়েই প্রচুর চাদর জড়িয়ে সাইকেলে চেপে বসল। এই সময়টা এই ছোট শহর খুব মায়াবী। প্রায় সমস্ত বাড়ির উঠোনে নানা মরশুমের ফুল। কেউ আবার সাধ করে পালংশাকও চাষ করেছে। একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে তাই বাচ্চারা চটপট খেলা শেষ করছে। ছোট মাঠ। এইখানটায় এসে অনির্বাণ থেমে যায়। চারপাশে ঘন পেয়ারাবাগান। কয়েকটা মাত্র বাড়ি আর এরই মাঝে একটা ফাঁকা জায়গায় মাঝারি মাপের একটা মাঠ। কাছেই এর চেয়ে বড় একটা মাঠ থাকায় এর নাম ছোট মাঠ। অনির্বাণ এই পৌনে পাঁচটার বিকেলে টানটান দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে চারপাশকে। যেন আর কোনওদিন দেখবে না। এই তো গতকালই হবিষ্যান্ন রাঁধার সময় বড়দি বলল "আলো তোর জন্য একটা কাজ দেখেছে। যাস। পরে প্রাইভেটে পড়ে নিস। দেখছিসই তো আর চলছে না। অরি আর একা কত টানবে।" চাকরি! চাকরি মানে তো আর নিজের মতো সাইকেলে করে আসা হবে না এই সব জায়গায়। এলেও পরের দিন বেরনোর তাড়া থাকবে। ভাবলেই কেমন একটা কষ্ট ভিতর থেকে পাকিয়ে উঠল শরীরে। আর লেখা? রঞ্জিত শুনে বলেছিল "সরকারি চাকরির খোঁজ নে।" সে খোঁজ নেবার আগেই আলোমামা নিয়ে গিয়ে এক রেকর্ডের দোকানে বসিয়ে দিল। কলেজের মেধাবী ছাত্র। সবেমাত্র চারু মজুমদারের চিঠির উত্তেজনা ও নির্মলদার পার্টি লাইনের দ্বন্দ্বময় জগতে ঢুকছিল... তার সামনে এখন ধর্মতলা স্ট্রিট আর ম্যাডান স্ট্রিটের হলুদাভা। ট্রামের ঘণ্টা শুনলেই শুধু কলেজে চলে যেতে ইচ্ছে করে। সবিতা? নির্মলদা এখন নিশ্চিত সাইকেল নিয়ে চলে যাচ্ছে বিশেদার দোকানের

দিকে। অনির্বাণ যেতে পারবে না। ৬.৩০টায় ছুটি। তারপর দেড় থেকে দু'ঘণ্টা পর বাড়ি পৌঁছে শুধু খাওয়া সাধারণ কথাবার্তা বলে/শুনে কীভাবে যে সময় যাচ্ছে... কয়েক মাস পরে সেদিন কালবৈশাখ। ফেরার ট্রেনের মুখে অপেক্ষা করার কথা ছিল সবিতার। কীভাবে যেন সন্ধেটা জোগাড় করে নিয়েছিল। বাড়ি থেকে নয়। পার্টি থেকে। এই রেকর্ডের দোকানের কর্মচারী জীবনের শনিবারগুলোয় দুপুরে দেখা হয় সবিতার সঙ্গে। কখনও সবিতা আসে তার পার্ক সার্কাসের মেয়ে কলেজ থেকে রেকর্ডের দোকানে। অনির্বাণের পড়া শেষ হয়েছে। শুধু রবিবার বিকেলে পার্টি অফিসে একটু পড়া। নির্মলদা বলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পড়তে হবে। পুতুলনাচের ইতিকথা দিয়েছে। ভাল লাগছে না। বুঝতে পারছে না অনির্বাণ। এতদিন তার কাছে গল্প ছিল শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এইরকম লেখা তার ভাল লাগছে না। নির্মলদা এই ছোট শহরের লোক নয়। সে কলকাতা থেকেই এসেছে সংগঠনের কাজে। মধ্যবয়সি বা বুড়োটেই বলা যায়। সে ৪৯-এ জেল খেটেছে। তখন পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। এখন এই রাষ্ট্রপতি শাসনকালেও প্রায় তাই। কিন্তু অনির্বাণ এত তফাত টের পায় না। শুধু এটা বোঝে কংগ্রেস নামক দলটি ভাল নয়। অন্তত তাকে তাই বোঝানো হয়। কিন্তু কোথাও কি একটা গোলমালও আছে? নির্মলদাকে সবাই ভাল চোখে দেখে না। বলে নির্মলদা না কি বাচ্চা ছেলেমেয়ের মাথা খাচ্ছে সাহিত্য ফাহিত্য পড়িয়ে। পার্টির বই পড়ায় কারও মন নেই। নির্মলদা বলে উৎসাহ দেয় বই কিনেও আনে নিজে। পার্টির অন্যান্য লোকেরা বলে নকশাল। বলে গণতন্ত্রে ওসবের কোনও জায়গা নেই। পড়া দরকার কিন্তু সবার আগে দরকার পার্টি কী তা জানা। এইসব বাচ্চা ছেলেরা পার্টি কী তাই জানল না শুধু সাহিত্য ছাড়া। অনির্বাণ আনমনা হয়ে যায়। তার এসব কিছুই মাথায় ঢোকে না। তার কবিতা গল্প সবই কেমন যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রোজ যাতায়াতের রেলপথটাকে তার খুবলে খাওয়া মাছের শিরদাঁড়ার মতো মনে হয়। কাকের চোখ এড়িয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? ফেরার ট্রেনে আধঘুমন্ত শ্রমিকদের ভিড় দেখে তার কষ্ট বাড়ে। সে কি এই কম পয়সার শ্রমিকদের সঙ্গে বসে যাবার জন্য জন্মেছে? নির্মলদা বলে, "এতে কোনও অসুবিধা নেই। অসুবিধা তোর মাথায়। তুই বাকিদের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চাস না।" "কেন মেলাব?" "মেলাতে হবেই। কারণ কেউই ইচ্ছে করে এমন গায়ে গন্ধ জামা পরেনি" "কিন্তু আমার যে এ সবের কোনওটাই ভাল লাগে না।" "তোর কী ভাল লাগে?" "লিখতে। ভাবতে।" "তোকে প্রাইভেটে পড়াটা চালিয়ে যেতেই হবে।" "তাতে কি রেকর্ডের দোকান থেকে মুক্তি পাব?" "আবার ভাববাদী কথা! মুক্তি আবার কী? বল স্বাধীনতা।" আবার স্বাধীনতা কথা কানে যেতেই কেমন রক্তে বুদবুদ খেলে গেল। সত্যিই তো আমরা লড়ি, রক্তাক্ত হই স্বাধীনতার জন্য। নির্মলদা আবার বলে, "আগে সমাজটাকে স্বাধীন করতে হবে। যতদিন না গরিব-গুর্বো স্বাধীন হচ্ছে ততদিন তোর লেখা কেউ পড়বে না রে অনি। ওই লোকগুলোকে আগে দু'মুঠো খেতে দিতে হবে" বলে দূরে কোনও অনির্দিষ্ট লোকদলের দিকে আঙুল তোলে নির্মলদা। "শুধু খাওয়া-পরাই কি সব নির্মলদা?" "না তা নয়। কিন্তু ওগুলো না থাকলে বাকি আসবে কোত্থেকে?" অনির্বাণ উদাস হয়ে পড়ে। তাহলে তাদের নিজেদের বাড়িতে যেখানে দারিদ্র সর্বত্র থাবা মারছে সেখানে গান আসে কোত্থেকে?

বাড়ি ফেরার রোববার সন্ধে মানে শুধুই যন্ত্রণা। আগামিকাল আবার রেকর্ডের দোকান। আবার সেই একই রুটিন। ভাবতেই অনির্বাণ উত্তর পায় নিজের প্রশ্নের। খাওয়া-পরা নেই বলেই তো তার লেখা ধাক্কা খাচ্ছে।

চার

বিকেলকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি বলে মনে হয় অনির্বাণের। এখন এই তাড়াতাড়ি ফেরার শনিবার গ্রীষ্ম বিকেলের ট্রেনের জানলায় বসে অন্তত মাথায় এটাই আসছে গত কয়েকটা শনিবার। এই ম্লান অথচ গড়িয়ে থাকা নরমাভা, এই কোমল অথচ ভীষণ শক্তিশালী এই আলো কি সঙ্কেত দেয়? হ্যাঁ, এই স্থির দাঁড়িয়ে থাকার সময়টা চলে যাচ্ছে। আমরা বিকেল দেখছি না। আলো দীর্ঘ সময়ের জন্য নিভে যাওয়ার আগে এক প্রবল আকুতিতে হাতে-পায়ে সারা শরীরে মাখিয়ে দিতে চাইছে তার তীব্রতা। আমরা দেখতে পাচ্ছি না। পরক্ষণেই অনির্বাণের মনে হল অন্যেরা কি এসব ভাবছে? না। সকলেই আসন্ন রাজনীতি প্রবাহ, হত্যা, পুলিশ এ সব নিয়ে ব্যস্ত। কেন এমন মনে হচ্ছে অনির্বাণের? সেই দীর্ঘ মেরুদণ্ড রেখার মতো চলে যাওয়া রাস্তা ধরে সাইকেলে দীর্ঘ দীর্ঘ পাড়ি দেওয়া আর সম্ভব হচ্ছে না বলে? উজ্জ্বল ধূসর রেখা থেকে মীন শহরের পেটের দিকে নেমে এলে একটা খালের মতো নদী। তার দু'টি তীরেই ঘন বাগান আর সেখানেই তো বিকেল প্রকৃত হয়। সাদা, অ্যালুমিনিয়াম, লালচে হলুদ এবং নরম স্পর্শ আস্তে আস্তে নেমে আসে বাগানের গাঢ় সন্নিবেশের শরীরে। চুঁইয়ে নামে। অনির্বাণ স্পষ্ট দেখেছে বাইরে অন্ধকার প্রকট হবার পরেও বাগানের অনেক জায়গায় টুকরো আবছায়া থাকে। বাড়ির ভিতরে থাকে না। বাবা আর গান গায় না। হারমোনিয়াম কী এক অজ্ঞাত কারণে তোলা আছে। এখন শুধু ভাঙা বেসুরে গলা মেলানোর রেকর্ড। বিকেলকে বিচ্ছিন্ন লাগে ছুটির দিনে আকস্মিক বাড়ি থেকে গেলে। বাবার ভাঙা গলাটাকে বিকেলের আলো বলে মনে হয়। মায়ের স্তব্ধতাকে বাগান। মায়ের ভিতরেই তো সেই আবছায়া রয়ে গিয়েছে। আলোর ধূসর টুকরো। যত দিন যাচ্ছে বাড়িতে শুধু টাকাপয়সা ছাড়া আর কোনও যোগই যেন থাকছে না। বহু প্রসবিনী মায়ের কাছে শেষতম সন্তানের বিশেষ টান থাকে। অনির্বাণের ক্ষেত্রেও তাই ছিল। কিন্তু এখন সবই কেমন স্তব্ধ। দীর্ঘ ঝড়-ঝাপটার পর মা একেবারেই পাথর হয়ে গেছে। ইদানীং রান্নাও করে না। শুধু বড়দির মেয়েটা বড় হচ্ছে। তার সঙ্গেই নির্বাক বা বলা যায় টুকরো শব্দের খেলা—আবছায়ার খেলা। আলোর ধূসর টুকরো যদি আবছায়া হয় তাহলে শব্দের টুকরো খেলাকে কী বলা যাবে? একটা দীর্ঘদিন খোলা অ্যালবামে শুধু মরে যাওয়া না চেনা পূর্বসূরিদের অবয়ব। মানুষের গন্ধহীন অনুভূতিহীন। তেমনই মনে হয় মায়ের খেলাকে। হঠাৎ পাশ দিয়ে একটা ট্রেন চলে যাওয়ায় কেমন যেন সাড় আসে অনির্বাণের। গ্রীষ্ম বিকেলের আলোর প্রাণশক্তি অপরিসীম। যদিও প্রখর গরমে এ-শক্তি কারওরই বিশেষ কাজে লাগে না। অনির্বাণের লাগে। অনির্বাণের রোদ্দুর ভাল লাগে, অনির্বাণের আলো, বারবার মনে হয় যেন খুব জোরে কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইছে সে আর তার দরকার রোদ, কড়া খুব জোরালো। বুকের ভিতর কেমন একটা ভিজে ভিজে মনে হয়। শরীরটা নেতিয়ে পড়েছে। যদিও শনিবারের অফিস ফেরত বাড়ির পথটাকে আদৌ ক্লান্তিকর মনে হয় না তার আর এই ক্লান্তিহীনতাকে তরতাজা করে দিতে পারে রোদ। রেকর্ডের দোকানের কাজে সে জ্যাজ বলে একরকম পশ্চিমী সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে রোদ থাকলে তার মনে হয় কেউ জ্যাজ পিয়ানো বাজাচ্ছে, সঙ্গে ড্রাম। একটা চনমনে ভাব সারা শরীরে। বাড়ির সামনে আসতেই কানে এল পরিচিত ঝগড়ার শব্দ "তুই তোর বর খেয়েছিস বলে আর কারও বর জুটল না" "আর কারও বলতে তুই কী বলছিস? তোর জোটেনি মাগি নিজের গতরটা দেকেছিস?"

"গতর দেকাবি না একদম।" "কে দেখাচ্ছে।" "তুই দেখাচ্ছিস।" অনির্বাণ এগিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে। একইরকম চলে প্রায় রোজ। সন্ধে রাত অব্দি। আজ আর সময় নষ্ট করার কোনও অর্থ পায় না সে। চুপচাপ নিজের সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। আর বিকেলের আবছায়াও অবশিষ্ট নেই। শুধুই রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের হলুদ ৬০ পাওয়ারের উপস্থিতি। কোথায় যাবে অনির্বাণ? নির্মলদার ঠেক? সবিতার কাছে? খালের পাড়ে?

সামনে শুধু মীন শহর তার শীতল না হওয়া শরীর মেলে

দাঁড়িয়ে আছে। তিরতির করে কাঁপছে বুঝি তখনও প্রাণ না বেরনো প্রাণীর চামড়া? শিহরন এখনও অবশিষ্ট আছে? ছুটি চাই। এক দীর্ঘ ছুটি। শুধু এই শিহরনটাকে স্পর্শ করার জন্য। এই মীন শরীরের—মীন শহরের— প্রতিটি কোণ ছুঁয়ে আসার জন্য। প্রতিটি ঝোপঝাড়, খাল লোডশেডিং জ্যোৎস্না ও অমাবস্যা রাতের শীতলতা। গরমের সন্ধেবেলা প্রবল হাওয়ার খালপাড় থেকে শীতের দুপুরে কমলালেবুর খোসা ছাড়ানো চড়ুইভাতি। ভোগ করতে হবে। সর্বশরীর দিয়ে। সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে। তীব্র বেঁচে থাকা দিয়ে। "তারপর কী করবি?" রঞ্জিতের প্রশ্নে আবেগ ভেঙে যায়। "এ তো তুই সারা বছর ছুটিতে থাকার কথা বললি।" মাথা নিচু করে চুপচাপ হাসে অনির্বাণ। "এটা তুই পারবি শুধুমাত্র পার্টির হোলটাইমার হলে।" "কিন্তু তাতে সংসার চলবে না আমার।" "কেন চলতে হবে সংসার।" "বাহ রে। সংসার কেন চলবে মানে?" "মানে কখনও প্রশ্ন করেছিস নিজেকে এই যে তুই নিজেকে এভাবে নিংড়ে দিচ্ছিস প্রতিদিন এটা কেন?" আবার মাথা নিচু করে হাসে অনির্বাণ। সে জানে রঞ্জিত এখন সংসার ইত্যাদি একদম সহ্য করতে পারে না। তার সামনে একটাই জীবন—পার্টির সর্বক্ষণের কর্মীজীবন। নির্মলদা এসে পড়ায় এইসব আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। "কী বলছে তরুণ লেখক?" নির্মলদা সবসময় একটা স্নেহ মাখিয়ে কথা বলেন। অনির্বাণকে তরুণ লেখক বলে সম্মান দেন। যদিও অনির্বাণ লেখা ছেড়ে দিয়েছে প্রায়। প্রায় কেন? ছেড়েই দিয়েছে। শুধু একরাশ অনুভূতি জড়িয়ে থাকে ভাবনার প্যাঁচে। "কীরে অনি নতুন কিছু শিখলি?" মাথা নিচু করে নিঃশব্দে নাড়ে অনির্বাণ। "কী করে লিখবে নির্মলদা। ও সংসারের বেগার খাটছে।" রঞ্জিত ঝাঁঝিয়ে ওঠে। "কী রে অনির্বাণ তুই লিখছিস না কেন?" নির্মলদা নরম স্বরে বলে ওঠেন। অনির্বাণ স্থির। মাথা নামিয়ে। নির্মলদা হাতের তালুতে ওর থুঁতনিটা রেখে পরম মমতায় তুলে ধরেন। "আরে পাগল কাঁদতে আছে এ জন্য! আমরা তো আছি। বল আমায় বল।" বুকে মাথাই টেনে নেন নির্মলদা। চোখের জলে টলমলে স্বরে অনির্বাণ বলে, "আমি আর পারছি না নির্মলদা। এই বাড়ি আর রেকর্ডের দোকানের কর্মচারীর জীবন আমি আর নিতে পারছি না। মনে হয় সব ছেড়ে পালিয়ে যাই।" "কোথায় যাবি বল।" মাথার চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে বলেন নির্মলদা। "জানি না।" "তাহলে? শোন আমি বলি কী—একটু খোঁজখবর রাখ। অনেক জায়গায় লোক নেয় মাঝে মাঝে। ওই সব চাকরিতে হয়তো সময় পাবি একটু। লিখবি, তুই। তোকে লিখতেই হবে।" নির্মলদার রোগা শ্যামবর্ণ তীক্ষ্ণনাসা উপস্থিতি ঝকঝক করছে।

পাঁচ

সারাক্ষণ যখন মনে হচ্ছে মাথার ভিতরে একটা স্রোত, নোনতা জলপ্রবাহ, মাথার ভিতরে একটা অস্থিরতা। রোজ যাতায়াতের ট্রেনের সঙ্গে লাইনের ঘর্ষণ যখন টের পাওয়া যাচ্ছে নিজের প্রতিটি প্রত্যঙ্গে, আকর্ষণ জন্মাচ্ছে— চুম্বকপ্রতীম—ওই রেললাইন ও তার জোড়নের তীব্র শব্দের প্রতি। চোখ বুজলেই মাঝে মাঝে ঠিকরে উঠছে ভারী কাটা হাত, মণিবন্ধে নিজেরই ঘড়ি। যখন বারবার মনে হচ্ছে কত তুচ্ছ এই কাটা পড়া—যদি অনেক ওপর থেকে এই ট্রেনের গমন দেখা যায় মনে হবে একটা চলমান রেখামাত্র; তারই তলায় কাটা একটা তুচ্ছতর লোক—কী যায় আসে? নির্মলদা যতই বলুক অনির্বাণ লিখবে কিন্তু সে রাস্তা পাচ্ছে না, উপায় দেখছে না। কিন্তু ইচ্ছেটাও মরছে না। সঙ্গে থাকছে রেলপথ ও ধাতব আহ্বান। এই প্রবল মাথা নামানো, মাথা ধরা সময়টার মধ্যেই নির্মলদা এক মঙ্গলবার সন্ধেতেই জরুরি তলব করলেন। যদিও জানা ছিল মঙ্গলবার অনির্বাণ কিছুতেই আসতে পারবে না। বাকি দিনগুলোয় সম্ভাবনা থাকলেও মঙ্গলবার দোকান থেকে বেরনো যায় না মালিকের বাবার উপস্থিতির কারণে। চোখের সামনের ধর্মতলা এলাকা পেঁচিয়ে ওঠে মাথার মধ্যে, এলাকার ব্যবহৃত হয়ে যাওয়া ধূসরিমা প্রতিটি রন্ধ্রে ঢুকে যায়। কিন্তু যেতেই হবে—যত রাতই হোক। ছোট শহরের পুজোর আগের রাত ১০.৩০ মানে সন্ধেই বলা যায়। কিন্তু ক্লান্ত মানুষের সন্ধে মানেই রাত। প্রায় ঢুলতে ঢুলতে যখন অনির্বাণ এসে পৌঁছতে চাইছিল পার্টি অফিসে তখন মীন শহরের পেট হলুদ হয়েছে। লোডশেডিং ও রাস্তার ধারের বাড়িগুলো থেকে ঠিকরে বেরনো কেরোসিন বা অন্যান্য আলো জাতীয় হরিদ্রাভা। এই হরিদ্রাভার মধ্যে দিয়েই আস্তে আস্তে পৌঁছে যাবে বিশেদার দোকান যা কি না নিজেদের মধ্যে পার্টি অফিস নামে পরিচিত। নিজেকে নেশাতাড়িত বলে মনে হয়। ক্লান্তিও কি এক ধরনের নেশা? আসলে তো আমরা নেশা করতে চাই না—শুধু রক্তের ভিতরে কী যেন একটা টান থাকে। আর তার প্রভাবেই এতকিছু। যে কাজ ভাল লাগে না, সে তো শুধুই ক্লান্ত করে। এই ক্লান্তি নেশা হতে পারে না। "শোন তোর জন্য খবর আছে।" "কী খবর? রঞ্জিতকে দিয়েই বলে দিলে পারতেন না?" অনির্বাণ কেমন একটু ঝাঁঝিয়ে ওঠে। জুড়ে দেয় "আর কোনও পার্টি ফার্টি আমার ভাল্লাগে না। আমি মজুর। আমাকে মজুরই থেকে যেতে হবে।" ভীষণই জোরালো গলায় বলে ওঠে অনির্বাণ। নির্মলদা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলেন। এগিয়ে এসে মাথা নামিয়ে সদ্য মৃত প্রাণীর মতো কাঁপতে থাকা অনির্বাণকে দু'হাতে স্পর্শ করেন। কাঁধে। অনির্বাণ হিস্টিরিক হয়ে ওঠে। "ছেড়ে দিন আমায়। আমার কিচ্ছু হবে না। আমি শুধু বিভিন্ন লোকের ব্যাগার খেটে যাব। ইমোশনাল ব্লেভারি।" হাত কাঁধ থেকে নামিয়ে দেয় অনির্বাণ। আবার শক্ত করে কাঁধ স্পর্শ করেন নির্মলদা। "থামলি কেন বল। আমি শুনব। আর শুনব বলেই ডেকেছি তোকে।" অনির্বাণ চুপ করে থাকে। তিরতির করে কাঁপছে তার রোগা যুবক চেহারা। তীব্র ক্ষুধার্তের সঙ্গেই তুলনা করা যায় তার এই রাগকে। "শোন, আমি তোর জন্য একটা চাকরি দেখেছি। মাইনে খারাপ নয়। এবং তোর জন্য ভাল" "চাকরিই তো, ভাল কী করে হবে?" "কিন্তু এ-চাকরি তেমন খারাপ নয়। তুই লিখতে পারবি।" "চাকরি করে সংসার টেনে কেউ লিখতে পারে না।" "তুই পারবি।" "কী করে?" "আচ্ছা তুই বল কে চাকরি না করে বাংলা ভাষায় লিখেছে?" "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও দশা হয়েছিল কেন?" "কী দশা?" "না খেতে পাওয়া দশা, চাকরি তোকে করতে হবেই। শুধু একটু কম ঝঞ্ঝাটের কাজ খুঁজতে হবে।" "তুমি কী কাজ দেখেছ?" "ব্যাঙ্কে কাজ।" "মানে?" "মানে ব্যাঙ্কে কাজ। তুই এই কাজে সময় পাবি। যাকে তুই শুধু লেখা ভাবছিস তা তো নয়, আসলে তুই নিজের জন্য সময় খুঁজছিস। কিন্তু একটা কাজ তো চাই। এই কাজে যদি তোকে যদি নেয় শেষ পর্যন্ত তাহলে দেখবি অনেকটা সময় পাবি নিজের জন্য।"

"কোথায় যেতে হবে?" "তোর দোকানের কাছেই। ওই যে চিনে রেস্তোরাঁটা আছে তার ঠিক পাশ দিয়ে একটা গলি ঢুকেছে। চিনিস?" "না। ওদিকে যাইনি কোনওদিন।" "কাল যাবি। দুপুরে খেতে বেরিয়ে ২টো নাগাদ যাবি।" "তারপর?" "ওখানে গিয়ে সমীরদাকে দেখতে পাবি।" "কোন সমীরদা?" "আরে উত্তর জেনারেল কমিটির সমীরদাকে ভুলে গেলি?" "হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কেমন একটা ফ্যাকাশে ফর্সা রং, সব শিরা সবুজ হাতের।" "হ্যাঁ, তবে এখন কয়েক সপ্তাহ হল দাড়ি রাখতে শুরু করেছেন সমীরদা।" "ও ঠিক চিনে যাব। কিন্তু কী করতে হবে?" "সমীরদাকে সব বলা আছে। তুই গেলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

গোটা শহর তখন শুধু কালো আর লালের মোজাইক। অন্ধকার কালোই বেশি তবে তার গায়ে উজ্জ্বল ক্রিমসন বেশ নজর টানে—আবার অনেক সময়ই তা শুকনো লাল—ফ্যাকাশে রক্তের। প্রায় সব রাস্তায় চারু মজুমদার জিন্দাবাদ। আর সব বাড়িতেই গোপনতা। ওই তো পাশের বাড়ির পারুলদি কলেজ স্কোয়ারে যাচ্ছে রোজ—৪ দিন হল সুবীর, ছোট ভাইটা বাড়ি

ফিরছে না। বন্ধুরা বলেছে শেষ কলেজ স্কোয়্যারেই দেখা গিয়েছে। কেমন সময়টা? চারদিক ফুটছে কিন্তু উত্তেজনা শুধু দাঁতের ফাঁকে। দুই চোয়ালের ঘর্ষণে। নির্মলদারা বলছে একদম ঘেঁষবি না ওদের দিকে। ওরা ভুল লাইন বেছেছে। কার লাইন? কীসের লাইন অনির্বাণ বুঝতে পারে না। শুধু দেখে তার সদ্য হওয়া চাকরির বাকি সহকর্মীরা রোজ সারিবদ্ধ পিঁপড়ের মতো একই চালে বাড়ি যায়। পরের দিন ফেরে। একই কাজ করে যায়। পুলিশ ভীষণই সক্রিয় এখন। নতুন সংযোজন হয়েছে পাকিস্তানের গণ্ডগোল। শোনা যাচ্ছে সেখানে নাকি লোকে আস্তে আস্তে জড়ো হচ্ছে পাকিস্তানি সরকারের বিরুদ্ধে। বাবা আর হারমোনিয়ামে বসে না। শুধু মদ খায়। একটা কঙ্কালসার চেহারা বারান্দায় সেই গান গাওয়ার জায়গাটাতে বসেই গানহীন মদ খায়। সেজদি আর বাড়িতে থাকে না। আলোমামা থাকে। সেজদি বাংলা সিনেমার এক নতুন সুরকারের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। বাড়ির সঙ্গে কোনও যোগ নেই। সেপ্টেম্বর যে এত ফ্যাকাশে হতে পারে তা ভাবেনি কোনওদিন, অন্তত অনির্বাণ। কিছুতেই বর্ষা যাচ্ছে না এমনটা নয়। বরং বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। শুধু রোদ ঝলমল করছে চারপাশে। অথচ সব আশ্চর্য থমথমে। এই ছোট মীন শহরেও নানারকম ম্লানিমা এসে ভর করেছে। রোজ, প্রতিদিন পুলিশ কাউকে না কাউকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। মারধর করছে। হারিয়ে যাচ্ছে লোকে। এই তো সেদিন বরানগর থেকে ১০০ জন মানুষের, টাটকা মানুষের, তাজা অনির্বাণের বয়সিদের রক্তাক্ত মরাশরীর পাওয়া গেল। কারা মারল? সরকার পার্টি আর পুলিশের যৌথদল? কেউ কিছু বলে না এখন। দাঁতে দাঁত চাপতে চাপতে চোখ শুধু ফ্যাকাশে দেখছে। মাথার ভিতরে শুধু একটা ভয়। এতদিন রেকর্ডের দোকানের যে চাপ ছিল, তা চলে গেলেও অনির্বাণ বুঝতে পারে শুধু নিজের মুক্তিই শেষ কথা নয়। আশপাশ থেকে চেপে ধরার, গলা ও নিঃশ্বাস, হাতগুলো বেরিয়ে এসেছে। এক অশেষ ধূসর পাঁচিলের সামনে দিয়ে হাঁটা। পাশ দিয়ে হাঁটা। পাঁচিলের গা ফুটো করে বেরিয়ে এসেছে অজস্র হাত। মুখ খুলে দেখা যায় না। শুধু খামচে ধরে। সুযোগ পেলেই গলা-মাথা হাত। আহ্ কেটে পড়ে যায়। যেখানে মনে হয় বাঁক। পাঁচিল বুঝি শেষ সেখানে রক্ত। চাপচাপ। তাজা। বাঁক ঘুরতেই আবার পাঁচিল। আবার ধূসর-ধূসরতর ম্লানিমা। হাত। দেহ, ছিন্নভিন্ন। পাঁচিলের ভিতর থেকে শুধু ভারী বুটের শব্দ আর বোমা, গুলি। অনির্বাণ ধড়ফড় করে বিছানায় ঠেলে ওঠে। ঘামে ভেসে যাচ্ছে শরীর। জানলা, তার মাথার পাশের জানলাটা দিয়ে রোদ ঢুকে এসেছে ঘরে। টেবিলে রাখা টাইমপিসের দিকে তাকায়। ৭টা। ওহ্ আজ রোববার। অনির্বাণ আশ্বস্ত হয়। করে নিজেকে। আর তারপরেই কান সজাগ হয়। মা কথা বলছে। মা? বড়দি বা মেজদি নয় তো? মেয়েরা বড় হলে মায়ের গলার সঙ্গে কেমন মিশে যায়। বাবার সঙ্গে ছেলের যায়? অনির্বাণ কান খাড়া করে। "কী বলচো গো? বউটা পাকিস্তান থেকে এয়েচে?"

"হ্যাঁ গো। নইলে আর বলচি কী।" "কী করে এল?" "বলচে মিলিটারি না কি ওর বরকে কেটে ফেলেচে। চোকের সামনে মেয়েকেও মেরেচে। ছেলে ছেলো সেও ফেরার।" "কী বলো গো?" "হ্যাঁ। বিশ্বাস না হলে চলো। বউটা মাজে মাজে কথা বলে মাজে মাজে চুপ করে যায়।" "পাগল হয়ে গেচে?" "হতেও পারে। বিড়বিড় করে নিজের মনে।" "কিন্তু পাকিস্তানে হচ্ছেটা কী?"

"তুমি জানো না? ওকেনে মিলিটারি বাঙালি দেকলিই মারবে।" "ও বাবা কী বলো গো?" "তাই তো শুনি। পিন্টুর বাবা তো তাই বলল। আমি খবরের কাগজে দেকিচি।" "কী দেকোচো?" "আরে পাকিস্তান থেকে দলে দলে লোকে চলে আসচে।" "কেন?" "আরে খানসেনা ওকেনে বাংলায় কথা বলতে দেকলেই মেরে ফেলচে?" 'খানসেনা কী?" "তুমি কোথায় থাকো গো বউদি?" গোটা কথাবার্তার মধ্যেই অনির্বাণ এসে পড়েছে সামনে। মা আর এ পাড়ার রুবি কাকিমা। অনির্বাণ স্পষ্ট জানে পাকিস্তানের পূর্ব দিকের ঘটনা। সে নানাভাবে বিষয়টার ওপরে নজরও রেখেছে। কিন্তু সে যুদ্ধের আঁচ যে এভাবে তাদের বসবাসের ছোট্ট শহরটাতেও এসে পড়বে তা টের পাওয়া যায়নি একেবারেই। "কিন্তু পাকিস্তান থেকে এল কী করে?" অনির্বাণ নিজের মায়ের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করে। তার বিস্ময় তখনও কাটেনি দীর্ঘ দীর্ঘ দিন বাদে মায়ের মুখ থেকে আওয়াজ শুনল সে। কে বলতে পারে মা হয়তো শুধু বাড়ির লোকের সঙ্গেই কথা বলে না। কোথায় যে অভিমান জমে সে বুঝতে পারে না। "ও বউটা তো অত কিছু বলতে পারেনে, ওর বিড়বিড় শুনে আর চিচকার শুনে তোমার কাকাবাবু বাবুনকে নে বেরলো। তার হাসপাতালে নে যেতি বোজা গেল।" অনির্বাণ আর নাক গলায় না এসব বিষয়ে। রাজনীতির বিষয়ে তার একটাই কৌতূহল এখন মার্কস। তবে গণতন্ত্রে থেকে। নির্মলদা তাকে খোলসা করে বুঝিয়ে দিয়েছে কেন নকশালরা ভুল। কেন জ্যোতিবাবু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার সময় ওদের দমনকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শুধু একটা উত্তর সে পায় না—কংগ্রেস যে নির্বিচারে এতগুলো লোককে মারছে তার কোনও বিচার নেই? কংশাল বলে একটা কথা চালু হয়ে গেছে। এরা কারা সবাই জানে কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না। শুধু প্রতিদিন ধরা আর পাকড়। পাকড় আর কাটা ধড়। অনির্বাণ নতুন কাজের জায়গায় মন দিয়েছে। সমীরদা মানুষটা ভাল। আস্তে আস্তে অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে বামপন্থী আন্দোলনের গুরুত্ব বোঝানোই এখন আসল পরীক্ষা। তবে অনির্বাণ কেন্দ্রের ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে, তাঁর নীতির সঙ্গে বামপন্থার কোনও বিরোধ পায় না। কিন্তু অফিস বা নির্মলদা সবার কাছেই সে শুনে এসেছে বা নিজের চারপাশে দেখছে সে পার্টিরই অন্য চেহারা। নির্মলদা খুবই আশাবাদী নিজেদের পার্টির ভবিষ্যৎ নিয়ে। এবং নকশালদের বারবার নস্যাৎ করতেও ছাড়ে না। কিন্তু পার্টি ক্ষমতায় পুরোপুরি এলে কি—সরকারি জিনিসে দখল বাড়ার মতো—তারাও অন্যদের মতো হয়ে যাবে না? নির্মলদা ভরসা দেয় "না। হবে না। আমাদের লড়াই যাবতীয় আগ্রাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে।" রক্ত গরম হয়ে ওঠে অনির্বাণের। "শুধু দুর্নীতি নয়, দেখবি যাবতীয় স্বজনপোষণ চলে যাবে আমরা ক্ষমতায় এলে।" অনির্বাণ স্পষ্ট দেখতে পায় তার কলেজ জীবনে লেখা একটা গল্পের দৃশ্য। দু'জন যুবক-যুবতী হেঁটে যাচ্ছে দীর্ঘ একটা রাস্তা দিয়ে। তাদের উল্টোদিকে বেরিয়েছে পার্টির বিজয় মিছিল। ছেলেটা শক্ত করে ধরে আছে মেয়েটার হাত আর তীব্রতর হচ্ছে স্লোগান বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

ছয়

অস্থির চারপাশের পরিস্থিতি কি অনুভূতিকে প্রভাবিত করে? হিম কম পড়ে? নভেম্বরের প্রভাতস্নান গায়ে কাঁটা আনে না? এমনকী বহু কাঙ্ক্ষিত লেখার সুযোগও বিন্দুমাত্র আঘাত করে না মাথায়? কোনও অনভূতিই তেমন করে আঁচড় কাটছে না। গতকাল অফিসে অনির্বাণকে ডেকে সমীরদা বলেছেন, "কাল টিফিনে বেরিয়ে 'সাপ্তাহিক সমকাল'-এ যাবি। আমি কথা বলে রেখেছি। তুই কাজ পাবি ওখান থেকে।" "কী কাজ?" "লেখার কাজ।" আর কিছু ভাবার অবকাশ ছিল না অফিসের স্বাভাবিক কাজের ধাক্কায়। পরের দিন সকালে যখন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে তখন সামনে সেই মহিলা দাঁড়িয়ে। আপনমনে বিড়বিড় করে চলেছেন। অনির্বাণ পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় ভাবল এই যাওয়াটা কি প্রতীকী? সে কি আরও অনেক কিছুকেই পাশ কাটাচ্ছে? টিফিন অব্দি একটা সামান্য উত্তেজনা বুকের ভিতর চিনচিন করছিল। সেই এত চাওয়া লেখার সুযোগ। তাও 'সমকাল'-এ। ভাবা যায়? যখন সে গিয়ে পৌঁছেছিল সমকাল অফিসে তখন নভেম্বরের দুপুরের রং ফ্যাকাশে কমলালেবুর খোসার মতো। কিন্তু অসুস্থ মনে হচ্ছে রংটাকে। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ ম্লান। তিনতলায় অধীর বাগচির ঘর। মানে কেবিন। একদা নামী কবি এখন সফল নামী

রাজনৈতিক কলাম লেখক। গোটা বাংলা তাঁর লেখা রিপোর্ট পড়ে মুগ্ধ। অনির্বাণও।

টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ অনির্বাণের উপর মগ্ন অধীর বাগচির দৃষ্টি পড়তে একটা প্রশ্নবাচক আবহ তৈরি হল, স্বাভাবিক। চটক ভেঙে অনির্বাণ বলল, "আমাকে সমীরদা, মানে...।" "বুঝেছি।" "আমি..." "কী লিখবে বল।" "মানে?" "মানে কী বিষয়ে লিখবে?" "মানে আমি তো... ঠিক...।" "আমাদের এখানে তুমি ফিচার লেখার সুযোগ পাবে। কিন্তু তার জন্য তো বিষয়টা বলতে হবে।" "আমি..." "শোন তুমি তো মফস্বলের ছেলে। তুমি তোমার অঞ্চলে কংগ্রেস-এর কোনও প্রবীণ নেতা থাকলে তাঁর একটা সাক্ষাৎকার নাও। দেখ তিনি কী বলেন, বর্তমান সরকারের আচরণ সম্পর্কে।" "কিন্তু..." "ও রাজনীতিতে ভয়?" "না ভয় না।" "তাহলে দ্বিধা কেন?" "আচ্ছা।" বেরিয়ে আসার পর রাস্তাটাকে মনে হচ্ছিল একটা মগ্ন ধূসর ভেলা। এতদিনের কাঙ্ক্ষিত লেখার সুযোগ। কিন্তু মাথাটা কেমন অনুভূতি শূন্য। কেন? সেটা কি গল্প লেখার সুযোগ ঘটেনি বলে?" সমীরদা বললেন, "আগে ফিচার লেখা শুরু কর। তারপর একদিন একটা গল্প দিয়ে আসবি অধীরদাকে। ঠিক হয়ে যাবে। আগে পরিচিতিটা তৈরি কর।" একটা মৃদু উচ্ছ্বাস মাখানো সন্ধেবেলা। অথচ তেমন উত্তেজনা হচ্ছে না। সেই অস্থির ভাললাগাটা জাপটে ধরছে না। এতদিনের অবদমিত ইচ্ছে এভাবে হাতের ভিতরে এসেও কেন ভাললাগা নেই? নির্মলদাকে বলতে আর একটু উত্তেজনা কমে গেল। "কংগ্রেসিদের নিয়ে লিখতে দিয়েছে। অধীরও রিঅ্যাকশনারি হয়ে গেল।" "কিন্তু এটা তো ভাল। নিশ্চয় বুড়োদের মধ্যে একটা অনুশোচনা থাকবে। সেটা প্রকাশ্যে আসবে।" "কিস্যু আসবে না। কংগ্রেস মানে ক্যাপিটালিস্টদের দাস। আমাদের শত্রু।" বাড়ি ফিরে এসে আর কিছুতে মন যায়নি। অনির্বাণ বুঝতে পারছিল আনন্দের রং এখন থেকে ধূসরেই চিনতে হবে। কারণ নির্মলদার কাছ থেকে ফেরার এতদিনকার রং ছিল উজ্জ্বল। আজ অদ্ভুত তেতো লাগল রাত্তিরটা। অফিসে সমীরদাকে জানাতে বললেন, "তুই নির্মলকে নিয়ে ভাবিস না। আমি সামলে দেব। তুই লেখ।" না বললেও হয়তো অনির্বাণ তাই করত। কিন্তু পার্টি থেকে বের করে দেওয়ার একটা ভয় আছে। কী-ই বা হতে পারে ভাবে অনির্বাণ। কিন্তু পার্টিই কি তার কাছে সব? কে জানে। একটা বড় অংশ তো বটেই। এইসব দ্বিধা ও বিরোধ ঝেড়ে সে যখন শেষ পর্যন্ত হাজির হল তাদের ছোট শহরের প্রাক্তন জমিদার তথা কংগ্রেসের বৃদ্ধ নেতা সলিল রায়চৌধুরির বাড়ি তখন হেমন্ত শেষের মীন শহরকে মীনগর্ভ বলে মনে হচ্ছে। মাছের পেটের ভিতরটা কি ঠাণ্ডা? কে জানে তবে কেন যেন অনির্বাণের মাথায় শুধু এই অনুভূতিটার কথাই ধাক্কা মারল চারদিকে শুধুই যুদ্ধের কথা। 'বাংলাদেশ' শব্দটাকে শোনা যাচ্ছে জোরদার। মুক্তিযুদ্ধ। সে নিজে গিয়ে দেখে এসেছে কীভাবে মানুষ অসহায়ভাবে, সম্বলহীনভাবে আশ্রয় নিয়েছে প্রতিবেশী দেশের রাজপথে। এবং এই সব আগমনের আঁচ পড়েছে তাদের মফস্বলেও। বেশ কিছু জায়গায় এসে পড়েছে যুদ্ধের শিকার মানুষ। আর দখল হয়ে গেছে অনেক ফাঁকা জমি। এমনকী শুধু দু'-তিনজন চাকর থাকা বড় জমিদারবাড়ির নাচঘরটাও দখল হয়ে গেছে। আর এই দখল হওয়াটাকে বাস্তিল দুর্গের পতনের সঙ্গে তুলনা করেছে নির্মলদা। অনির্বাণ যখন সলিল রায়চৌধুরির সামনে তখন রবিবারের বিকেল উথলে উঠে তার শেষ সোনালি তরল লেপে দিচ্ছে আগত সন্ধের গায়ে। "তুমি আমার সঙ্গে কী কথা বলতে চাও?" "এমনিই। এই যে চারপাশে এত অশান্তি, একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে কেমন লাগে এইসব?" "শোন আমি এইসব বাঙালদের নিয়ে আদিখ্যেতা একদম সহ্য করতে পারি না।" "মানে..." "মানে আবার কী। এই যে এত যুদ্ধ, এত সেনা পাঠানো। এতে হচ্ছেটা কী? আমাদের মতো লোকদের বাড়িঘর দখল হয়ে যাচ্ছে। তুমি তো ভাল ঘরের ছেলে। তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস কোর।" "না আমি এটা মানি না।" "কী মান না? নাকি আমার কথা মান না।" "আপনার কথা... মানে..." "তুমি তো আমার কাছে জানতে চেয়েছ আমি চারপাশে যা ঘটছে তা নিয়ে—আমি কী ভাবছি তাই না?" "হ্যাঁ।" "আমি এটাই ভাবছি। আমার জমি জায়গা বেদখল হয়ে গেল আমি সেটা মানছি না। আমি বলছি ইন্দিরা ভুল করছে।"

"কী বলছিস রে।" নির্মলদা অনির্বাণের উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। "হ্যাঁ। বুড়ো সলিল বলেছে এইসব কথা।" "তুই একটা চড় মারতে পারলি না?" "ইচ্ছে করছিল। কিন্তু..." "কিন্তু তুই পালিয়ে এলি?" "হ্যাঁ।" সেদিন আর বেশিদূর কথা গড়ায়নি। বাড়ি ফিরে দেখেছিল বাবা অনেকদিন পর হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছে। স্পষ্ট গলায় অতুলপ্রসাদী গাইছে 'জল বলে চল, মোর সাথে চল'। অনির্বাণ ভাবতেও পারে না বাবা অসহায় যুদ্ধের শিকারদের সম্পর্কে এমন কিছু বলতে পারে। যদিও তাদেরও একটা পরিত্যক্ত জমির দখল নিয়েছে যুদ্ধ শরণার্থীরা। তবু অনির্বাণ চুপ থাকতে পারে না। দীর্ঘদিন পরে বাবাকে প্রশ্ন করে, "বাবা তুমি জান পাকিস্তানে যুদ্ধ হচ্ছে?" "কী হচ্ছে?" "যুদ্ধ" "না!" "সে কী তুমি জান না?" "কী হবে জেনে?" বলেই আবার হারমোনিয়ামে। বেসুরে 'একা মোর গানের তরী ভাসিয়ে ছিলাম নয়ন জলে।" অনির্বাণ ঘরে চলে যায়। কিন্তু পরিস্থিতি যখন উন্মাদনার চূড়ান্ত সীমায় যাচ্ছে, তখন সে কিছুতেই লিখতে পারছে না। সলিল রায়চৌধুরির সাক্ষাৎকার ভিত্তিক লেখাটা দাঁড়াল না। বদলে একটা গল্প লিখে ফেলল সে। তারপর সাহস করে শুনিয়েই দিল অধীর বাগচিকে। অধীরবাবু শুনে সম্পাদকসুলভ কিছু পরিবর্তনের কথা বললেন। একটু রাগ হলেও অনির্বাণ মেনে নিল সে সব কথা। যতই হোক সমকালের সম্পাদক বলে কথা। আর যদি ছাপেন তাহলে তো... "আমি ফেয়ার করে আপনাকে দিয়ে যাব।" সাহস করে বলেই ফেলল অনির্বাণ। "হ্যাঁ। তবে তাড়াতাড়ি দিও। আমি চাই এই গল্পটা যুদ্ধ চলার মধ্যেই বেরিয়ে যাক।" এই হ্যাঁ শব্দটা অনির্বাণ যেন কোনওদিন শোনেনি। শুক্রবার ৩ ডিসেম্বরের শীতল অ্যালুমিনিয়াম জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে তার ট্রেনপথ। তার বাড়ি ফেরার রাস্তা। কুয়াশা গজ কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়েছে যাবতীয় অস্থিরতাজনিত ক্ষত। সে এক রাত্তিরেই ফেয়ার করে ফেলবে গল্পটা। কিন্তু তা হয়নি। আরও তিন দিন লেগে গেল সাজিয়ে তুলতে। গল্পটা জমা দেওয়ার পরেই অধীরবাবু জানালেন, ১৮ তারিখের সমকালে বেরোবে। ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৮-র মধ্যে যে ফাঁক যে দিনগুলো তারা ভীষণই বিচ্ছিন্ন। এত বড় দু'সপ্তাহ কি অনির্বাণ কখনও কাটিয়েছে?

সাত

১৪ তারিখ রাত্তিরবেলা অনির্বাণের বাবা হঠাৎ রক্তবমি করতে শুরু করলেন। মানে বমির সঙ্গে রক্ত। আগের দিন সন্ধেবেলাই অনেকদিন পরে রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়ে সন্তোষ সেনগুপ্তর একটা ৭৮ আরপিএম বাজাচ্ছিলেন, 'তোমার পতাকা যারে দাও'। ভোরবেলা উঠে থেকে বেশ কয়েকবার। জ্যোতি ডাক্তার বাড়ি এসে দেখে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললে, বাবা তীব্র আপত্তি জানাল। বাবা কি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত? কেন যেতে চাইছে না? কিন্তু অনির্বাণের দাদা কোনও আপত্তি শুনল না। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হল। রেডিওতে শুধু পাকিস্তানের যুদ্ধ আর স্বাধীন বাংলা বেতার। তাদের গান। থমথমে কালচে সময়টাকে বিপুল অস্ত্র সাজিয়ে তুলত উত্তেজক সব বেতারবার্তা।

...প্রণবেশ সেন। অনির্বাণ জড়িয়ে পড়ছিল গানগুলোর সঙ্গে। যুদ্ধের সঙ্গে। আহত জাতির শরীরে। ডাক্তার বাবার ব্যাপারে কোনও আশাই দিতে পারেনি। রক্তের পরীক্ষায় যা ধরা পড়ছে তাতেও কোনও ভরসা নেই। থমথমে অথচ উত্তেজিত কলেজ স্ট্রিট চত্বর দিয়ে যখন ১৫ তারিখ রাতে একা রাত জাগার হাঁটা সারছিল অনির্বাণ তখন কোথাও যেন একঝলক মাথায় এল ১৮

তারিখ বেরোবে সমকাল। যুদ্ধ বিশেষ সংখ্যা। আর তাতে বেরোবে তার গল্প। ফিনাইল আর ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ, সঙ্গে ডাক্তারদের অসহায়, অপারগ চোখগুলোর মাঝখানে শুধুই স্পৃহাহীন নিজেদের আস্থা খোঁজার চেষ্টা। কলেজ স্ট্রিট ও তার আশপাশে জমা হওয়া কিছু সদ্য আবেগকে ভাবার আগেই ২৪ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। বাবার রক্তবমি বন্ধ হলেও কাশিতে রক্ত আছে। কিন্তু এক্সরে করে বুকে কিছু মেলেনি। ডাক্তাররা সারা দেহ টিপে টিপে দেখেছেন কোথাও কোনও সাধারণ ত্রুটিও পাওয়া যায়নি। অথচ জ্বর। অথচ কাশি। অনেক পরীক্ষার ফল মিলবে আগামিকাল। যুদ্ধের অবস্থার কথা কিছুই জানে না অনির্বাণ গত দু'দিনে। ভাবার চেষ্টা করে। ভোর হওয়ার ঠিক আগেকার রাত প্রহরে শুধুই কি অসুখের গন্ধ থাকে? অনির্বাণ নিজের ক্লান্ত অথচ জেগে থাকা মাথাটা তুলে ঠাহর করার চেষ্টা করে। পুব দিক কোনটা? বিশ্ববিদ্যালয় একটা অন্ধকারের ডেলা। অনির্বাণ নিজের বাঁদিকে চলা শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। মির্জাপুর স্ট্রিট ক্রসিং-এ দাঁড়ায়। কলেজ স্কোয়ারের মাথাটা কী থমথমে হয়ে আছে। ক'টা বাজে এখন? ঘড়ি ও সময়হীন অনির্বাণ ফিরে যাবার বদলে মির্জাপুর স্ট্রিট ধরে হাঁটা শুরু করে আমহার্স্ট স্ট্রিটের দিকে। কর্পোরেশন বিল্ডিংয়ের সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়ায়। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সামনে দু'জন লোক। গোটা মির্জাপুর স্ট্রিটই ফাঁকা। শীত করছে না কেন? অনির্বাণ আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকায়। প্রাইভেটে বিএ পড়তে হবে এবার। কিন্তু কি করে? বাবা আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় আর্থিকভাবে দুর্বল বাড়িটার অবস্থা তো জোরদার ধাক্কা খেল। শুধু চিকিৎসার ব্যয়ভারই কী বিরাট। আস্তে আস্তে মেডিক্যাল কলেজের দিকে ফেরে অনির্বাণ। হাওয়ার দাপটহীন শীতের এই সময় না জানা রাতটাই কি আসলে শীতকাল? সকাল কখন হবে? কোনও মহৎ অন্ধকার নাশ না হলেও দাদা এসে অনির্বাণকে ছাড়বে। তারপর ও বাড়ি যাবে। অসাড় ও অস্থির সময় চলে যাওয়ার মধ্যে কখন যে ঠিক আলো ফোটে কেউ বলতে পারে না। দাদা এসে জানাল সেজদিকে খবর দিতে হবে। আর সে কাজ নিয়ে যখন না ঘুমনো ক্লান্তি সমেত কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলাগামী ট্রামে চেপে বসল তখন চোখে শুধু ঘুম ও ঝুঁকে পড়া মাথা। রিচি রোডে সেজদির বাড়ি পৌঁছতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল। প্রথমবার আসা।

ঠিকানাটা জোগাড় করেছিল দাদা। আর কিছু জানা নেই। কে জানে এখন সেজদি আছে কি না। ছিমছাম তিনতলা বাড়ি। গেটে নাম লেখা। বিখ্যাত সুরকার। তলায় সেজদির নামটাও রয়েছে। পদবি অটুট। স্নায়ুতে জোরালো আঘাত করা বেলটা বাজাতে এক বৃদ্ধা দরজায় "কাকে চাই?"

"করবী... মানে আমি করবীর ভাই... মানে করবীর বাবা..."

"এত ইতস্তত করছেন কেন? আসুন। করবী রেয়াজ করছে। হয়ে গেলে এসে কথা বলবে।" শীতল ও মায়াহীন স্বর যতটা না ক্লান্তিকে অপমান করছে তার চেয়ে বেশি স্নিগ্ধতা আসছে দোতলা থেকে এই নিঃশব্দ বাড়িটার বুকে তীব্রতা ছুড়ে দেওয়া একটা সুরেলা চেনা গলা "একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলাম নয়ন জলে, সহসা কে এলে গো।" আবার অতুলপ্রসাদ। স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই সব দিন যখন ছোট্ট অনির্বাণ দিদির আঁচল ছাড়ত না। বাবা দিদিকে শক্ত শক্ত গান শেখাত। এই সব গান। কী আছে দিদির গলায়? অনির্বাণ কেমন একটা নিশ্চিন্ত বোধ করে। দিদির গানের পাশে শুয়ে সে কত রাত কাটিয়েছে। দিদি খালি গলায় গাইত আর মাথায় হাত বুলিয়ে দিত... "কে এসেছে মেনকা?" সুরভাঙা প্রশ্নে চটক ভাঙে। মেনকা উত্তর না দিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে যায়। বোঝাই যাচ্ছে অনির্বাণের পরিচয় তাঁর বিশ্বাস জাগায়নি। বেরিয়ে এসেছে সেজদি "তুই?" "বাবা খুব অসুস্থ।" "আমি টাকা দিতে পারব না।" "কী বলছিস তুই? আমি টাকা চাইতে আসিনি।" "কেন এসেছিস তা'লে?" "তোকে খবর দিতে।" "আমার দরকার নেই খবরের। তুই চলে যা।"

আজ বাড়ি ফেরার বিকেলটাকে কী বলবে অনির্বাণ? প্রায় অসাড় শরীরটাকে টেনে যখন বাড়ি পৌঁছল, তখন শুধু পাথর মা আর হাউ হাউ করে কেঁদে চলা বড়দি ছাড়া সামনে কিছু নেই। "কী হয়েছে?" "বাবা আর নেই।" "মানে?" "তুই হাসপাতাল থেকে চলে আসার পর আবার রক্ত বমি করে। একটু আগে ধ্রুব জেঠার বাড়িতে ভাই ফোন করেছিল" "ক'টার সময় হল?" "চারটে।" শোক বা আঘাত নয় অনির্বাণের মাথায় তখন শুধু বিরক্তি। "আমি কি আবার হাসপাতাল যাব?" "না। ভাই আর ওর স্কুলের বন্ধু অপু আছে। ওরা নিয়ে আসবে।"

নির্বিকার, কান্না ও প্রস্তরতার মাঝখানে বেশিক্ষণ না থেকে প্রায় অসাড় শরীরটা টেনে অনির্বাণ নিজের ঘরে ঢুকেই বিছানায় এলিয়ে পড়ে। পিছনের বাড়িতে তখন প্রবল জোরে রেডিওতে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪.৩০ মিনিটে পাক জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ করেছেন। অনির্বাণ উত্তেজিত হয় না। আস্তে আস্তে ঘুমের লেপে নিজেকে মুড়ে নেয়।

শ্মশান থেকে ফিরে হারমোনিয়ামটা ছাড়া আর কাউকেই নিঃসঙ্গ মনে হয়নি অনির্বাণের। বস্তুত শ্মশান থেকে ফেরার পরমুহূর্ত থেকে এখন এই ১৮ তারিখ সন্ধেবেলা যখন বাড়ি শোক ভাগ করে নিতে আসা জনতার কলহাস্যে স্তব্ধ তখন বাড়ি থেকে বেরনোর সময় হারমোনিয়ামটাকেই সবচেয়ে পরিত্যক্ত মনে হল। আশ্চর্য লাগছিল আলনায় ঝুলে থাকা বাবার জামাগুলোর দিকে তাকিয়ে। বুশ শার্ট। এই হাতাগুলোয় আর এতদিনের পরিচিত গায়ের গন্ধ লাগবে না। একদা গালের লালা ও দোক্তাপাতা চিবোনোর ছিটে এখনও উজ্জ্বল হলেও তা এখন আর ভিজে নয়। হয়তো আর কেউ দাগটাকে তুলতে চেষ্টাও করবে না। সাইকেল চালিয়ে যখন অনির্বাণ পৌঁছল বিশেদার দোকানে তখন সন্ধে চেটে খেয়ে ফেলেছে গোটা এলাকা। ভীষণ প্রতীকীভাবে কেরোসিন ল্যাম্পে আলোকিত হয়ে আছে দোকান। বোঝাই যাচ্ছে নির্মলদা আর রঞ্জিত বসে আছে। পিছন থেকে হিন্দি গান বাজছে। "তেরি দুনিয়ামে জিনে সে তো বেহতর হ্যাঁয় কে মর যায়েঁ।" "কী গো আজও হিন্দি গান বিশেদা। একটু বাংলা গান বাজাও।" "কেন আজ কী বিশেষ দিন?" "আরে বাংলাদেশ জন্ম নিল তুমি এখনও..." "শোন অনি আমার গান আমায় শুনতে দে।" "নির্মলদা তুমিও কিছু বলবে না?" "কী বলব? তুই বাজে কথা রেখে এদিকে আয়। বোস এখানে।" অনির্বাণ রঞ্জিতের দিকে তাকাল। রঞ্জিত কী যেন একটা বলার চেষ্টা করছে। বা বলতে চাইছে কিন্তু পারছে না। "কী হয়েছে। তুই কিছু বলবি?" "হ্যাঁ, মানে বাড়িতে সব ঠিক আছে?" "কী ভুল থাকবে?" "না এমনই... তুই কি সমকাল দেখেছিস?" মৃত্যুর সরাসরি ধাক্কায় অনির্বাণ সমকালের কথাটা ভুলেই গিয়েছিল। আবার উত্তেজনা ফিরে এল। "তুই দেখেছিস? আমি এখনও দেখতে পারিনি। আর মনেও ছিল না।" "হ্যাঁ। আমি এনেছি।" "দেখা, দেখা ফেলে রাখছিস কেন?" "এই নে। তবে..." "তবে কী?" "তুই নিজেই দেখ।" সূচিপত্র থেকে শেষ পাতা অবধি সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও নিজের নাম বা লেখা দেখতে না পাওয়াটাকে অনির্বাণ কী হিসাবে দেখবে বুঝতে পারেনি। বিশেদার দোকান থেকে সাইকেল চালিয়ে প্রবল জোরালো গতিতে চলে গিয়েছিল খালের দিকে, তারপর কী মনে করে খালপাড় ধরে আরও কিছুক্ষণ সাইকেল নিয়ে এদিক-ওদিক করে যখন প্রবল শীতেও ঘাম ঝরছে তখন আবিষ্কার করে নিয়েছিল প্রবল অন্ধকারের খালপাড় রাস্তা বাগানের শরীরে জ্বলে থাকা দু'একটা আলো আসলে আকাশেরই অংশ। অন্ধকার আকাশ আর রাত এক অভিন্ন সত্তা। বাড়ি ফেরার পর বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদে ফেলেছিল সেদিন। কার জন্য? বাবাকে মনে পড়ছিল খুব। জীবনে প্রথম পরীক্ষায় ফেল করে আসার পর বাবা মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল অনেকক্ষণ। গান থামিয়ে। প্রশ্ন

করেছিল—"তোর কি পরীক্ষা দিতে ভাল লাগছিল না?" মেধাবী ছেলের পরীক্ষায় ফেলকরা দেখে খেয়ালি বাবার তাই মনে হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। অধীর বাগচির কাছে গিয়ে ভিতরে জমে থাকা অভিমান এবং রাগ কোনওটাই উগরে দেওয়া যায়নি। কারণ কিছুই হয়নি এমন কায়দায় অধীরবাবু একটা ছোট ফিচার লেখার কথা বললেন। আসলে একটা কলাম ফাঁকা যাচ্ছিল, এক বিশেষ সংখ্যায়, তাকে ভরানোর জন্য, কিন্তু গল্পের ব্যাপারে একটা বাক্যও ব্যয় করলেন।

আট

অভ্যেস কী? সোনালি ডানার চিল যখন শেষতম উড়ানে বাসার কাছে পশ্চিমদিকের সূর্য দিনের শেষতমবার ঝলমলে করে দিল রং—আর একটু পরেই চিলকে তার বাসা সমেত গিলে নেবে অন্ধকার। এই যে প্রতিটি ছুটির দিন, ছুটির সঙ্গে এইভাবে অফিস-কাগজের দফতর-সবিতা-নির্মলদা-বাড়ির গানহীনতা-ঝগড়া : এই সবই কি অভ্যেস? রবিবার সূর্য ডোবার আগে খালপাড়ে সবিতার সঙ্গে বসে থাকার স্তব্ধতায় এই সবই মনে হয়। হচ্ছে। সন্ধেটাই কি তাহলে অভ্যেস? অন্ধকার জাঁকিয়ে বসা? সবিতার হাত ছোঁয় সে। ঠাণ্ডা। এপ্রিল মাসের সন্ধে। কালবৈশাখী না থাকার ব্যর্থতা কি সবিতাকেও ছুঁয়ে ছিল? সবিতা হাত সরিয়ে নেয়। "কত বয়স হল?" "২৫।" "আমারও ২৫।" "কী বলতে চাইছ?" "বিয়ের কথাটা ভেবেছ?" "কী করে বিয়ে করব?" এই প্রশ্নের উত্তর সেদিন পাওয়া না গেলেও একঝলক ঝড় উঠেছিল। বৃষ্টি ও শিলাপতনের শব্দে রাত ১১টার বাড়ি যখন ব্যতিব্যস্ত তখন খেতে বসে দাদা জানিয়েছিল তার বিয়ের কথা। সে বিয়ে করে ফেলেছে এবং বাড়ি ছাড়ছে। বাড়িতে বিস্ময় নামক শব্দটির কোনও অস্তিত্ব না থাকায় মেজদি অতি স্বাভাবিক স্বরে যেন দাদা বেড়াতে যাবে— প্রশ্ন করল "কবে যাবি?" "আগামী সপ্তাহে। আর এ বাড়ির খরচ দিতে পারব না।" অনির্বাণের কানে কথাগুলো ঢুকছিল আর সে মনে মনে গুনছিল তাকে আর কী কী করে সংসারটাকে সচল রাখতে হবে। গল্প আর কোনওদিন না ছাপা হলেও সমকাল দলের খবরের কাগজ খবর প্রকাশ-এ সে মাঝে মাঝে ফিচার লেখার সুযোগ পেয়েছে। কখনও বাংলাভাষার অক্ষর কখনও ডিটারজেন্ট পাউডারের কুপ্রভাব। নানা বিষয়ে এক কলাম করে লেখা বছরে ৮ বার। লিখে পয়সাও পেয়েছে। সে পয়সাও সে সংসারে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু দাদা চলে গেলে সে জোগান প্রতুল হবে না। তাহলে? মেজদির তীক্ষ্ণ স্বরে ফের সম্বিত ফেরে "তুই এবার অন্যকিছু ধরে নে অনি। ওই লেকা ফেকা ছাড়।" কোনও যোগ নেই আপাতত লেখা ও সংসারের। সংসার নামক বস্তুটির যাবতীয় দায় মাথায় নেওয়া সত্ত্বেও দিদিরা সুযোগ পেলেই লেখাকে খোঁটা দেয়। অনির্বাণের চোয়াল শক্ত হয়। রাগটা অধীর বাগচির ধান্দাবাজ মুখটাকে আঘাত করে। এই ক'বছর ফ্রিল্যান্স লেখালেখির জগৎ ঘুরে দেখে জেনে গিয়েছে অধীর বাগচি বা তার মতো বেশ কিছু সম্পাদকের চাহিদা। কেন ছাপা হবে তার গল্প? সে বা তার মতো অন্যান্য ছোট লেখকরা আস্তে আস্তে বড়জোর ফিচার লেখক। শুধু ছাপার অক্ষরে নিজের নামটা দেখতে পাবার একটা আশ্চর্য টান তাকে বারবার হাজির করে কখনও খবর প্রকাশ কখনও রোজ সকাল নামক খবরের কাগজের শনিবার আর রোববারের সম্পাদকের সামনে। অনির্বাণ তো শুধু লিখতেই চেয়েছিল। সেটা কী লেখা? টানটান ঝাঁঝ কমা হলুদ চৈত্র বিকেলের ধর্মতলা স্ট্রিটকে মায়াবী লাগে অনির্বাণের। রোজই হেঁটে শিয়ালদহ অবধি যায় সে। কমলালয়ের সামনে ফুটপাতে রেকর্ড দেখে। কী আছে সময়টায়? শুধু রক্তছাপ, এক ধরনের গন্ধ। অনির্বাণ উল্টেপাল্টে এলপি রেকর্ড দেখে। ছায়াছবিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত, লিজেন্ডস অফ গ্লোরি, হিটস অফ সলিল চৌধুরি, ঘুমভাঙার গান। একদা যে রেকর্ডগুলোকে শত্রু বলে মনে হত দোকানে কাজ করার সময় তাদের এখন কাছের জিনিস বলে মনে হয়। অভ্যাস কী? এই যে ঝুঁকে পড়া, এই যে ফুটপাথ জুড়ে থরে থরে সুর ও বিন্যাস, এই সমস্তই কী এক ধরনের অভ্যাস? কেউ যদি বন্ধ করে দেয় সব? সমস্ত অভ্যাসই ধাক্কা খায়। যেদিন অনির্বাণ শেষপর্যন্ত কিনে ফেলেছিল একটা পঙ্কজ মল্লিকের লং প্লে, যেদিন সে স্পষ্ট দেখেছিল বাবা তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে—অনেক দূর ছোটবেলার আলমবাজার ঘাটে—ফাঁকা শূন্যতায় বসে উদাত্ত গলায় গাইছে দিনের শেষে ঘুমের দেশে; গাইতে গাইতেই মদের বোতল বের করে আকণ্ঠ চুমুক আর থমকে গিয়ে অবোধ বালককে বলছে পঙ্কজ মল্লিক বুঝলি—তুই আর কী বুঝবি—সেদিন বাড়ি ফেরার রাস্তাটাকেই কি রেকর্ডের গ্রুভ মনে হচ্ছিল না? গোটা মীনগর্ভ মীন শহর তো এখন একটা বিরাট কালো ভিনাইল ডিস্ক। রাত। চকচক করে তার গায়ের রাস্তাগুলো আলো লেগে। চকিতে গান থেকে অন্য গানে যাবার মাঝেকার মোটা দাগ। কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেনি সেই সন্ধে। রেকর্ড নিয়েই গিয়েছিল বিশেদার দোকান। হিন্দি গানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কুমার হয়ে, 'জানে ও ক্যায়সে লোগ যে জিনকো'। সঙ্গে ছিল আশঙ্কা ইন্দিরা গান্ধী ও তার উগ্র বিরোধী লোপের চেষ্টা। কিন্তু সব ছাড়িয়ে লকলক করে উঠেছিল শিখা। বাড়ির মুখ থেকে সে চমকে উঠেছিল। একতলায় দাউদাউ করে জ্বলছে একটা খাট আর তার উপর স্তূপাকৃতি কিছু। দৌড়ে যায় অনির্বাণ। কেউ নেই আশপাশে। দোতলায় ওঠে। জ্ঞানশূন্য। দেখে মা ও দুই দিদি খাচ্ছে। নিশ্চিন্ত ভঙ্গি। অনির্বাণকে দেখে বড়দি বলল 'জ্বালিয়ে দিলুম সব'। "কী জ্বলছে ওটা?" "তোর খাট আর যা হাবিজাবি কাগজ ছিল।" "মা-আ-নে?" আর্তনাদ করে অনির্বাণ। ঝাঁপিয়ে পড়ে বড়দির গলা টিপে ধরে। "কী বলছিস কী তুই মাগি।" "ছাড় ওকে ছাড় ওকে।" করে মেজদি ঝাঁপিয়ে পড়েছে ততক্ষণে। অনির্বাণ শান্ত হয় শারীরিকভাবে। ওঠে। সিঁড়ি দিয়ে নামে। খাটটার কাছে যায়। আগ্নেয়স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে দু'চোখ বোজে। জল। টের পায় গালে। বহুকষ্টে খাড়া করা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা জ্বালিয়ে দিয়েছে ওরা। ওপরের বারান্দায় যেখানে বাবা গাইত সেখান থেকে ঝুঁকে পড়ে মেজদি বলছে "এবার সংসারে মন দে বুঝলি। ও সব লেকার বাই ছাড়।" সেই রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

নয়

সন্ধেটাও কি একটা অনুভূতি মাত্র? অন্ধকার আস্তে আস্তে চেটে নিচ্ছে বাড়ির সামনের গাছগুলো ঠিক যেভাবে একটু আগে কাঠবেড়ালির থাবার ধূসরতায় ঢেকে গিয়েছিল সদ্য আমের আকার পাওয়া অথচ ফল না হওয়া সবুজ ডেলা। এপ্রিল সেখানে

মে মাসের শরীরে লীন হয়ে যাচ্ছে, আলাদা করা যাচ্ছে না দুটো মাসকে, প্রখর গ্রীষ্মের ঔজ্জ্বল্যের গলা টিপে দিয়ে রোজ সন্ধে আসে। নরম কাঠবিড়ালির থাবার রঙে বিকেল তারপর তার পিঠের মতো মসৃণ একটা সন্ধে ও তার হাওয়া। তার সীমানা লোপাট করা হাওয়া। অনির্বাণ ভাড়াবাড়ির বারান্দায় বসে থাকে। এইসব সন্ধেবেলা বারান্দার ওপর একটা মন কেমন লতিয়ে ওঠে। নিজের কেনা রেকর্ড প্লেয়ারে চেনা গান বাজে। পান্নালাল, কে সি দে। কখনও শচীনদেব। আর শচীনদেব বাজা মানেই অবধারিত লতানে মনকেমন। কাল সকালে দাড়ি কামানোর সময় রক্ত পড়বে। তুলোয় মোছার সময় মনে হবে 'আজ বেরোব না'—আর এভাবেই বাড়ি থেকে গিয়ে এই সুদীর্ঘ দুপুরগুলোয় নিজেকে আরও নিঃস্ব করে তোলা। নিঃস্ব শব্দটির অর্থ কী? যখন স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার নিচে দাঁড়িয়ে সবিতাকে স্পর্শ করলেই আর বিন্দুমাত্র নরম থাকে না হাত। বারবার উঠে আসে বিয়ে করার প্রসঙ্গ—তখন নিঃস্বতার অর্থ কি অনির্বাণের সারাদিন জমিয়ে রাখা দেখা হওয়ার বাসনা? কেন দেখা করতে চায় সে? মনে হয় এইসব অফিস না যাওয়া দিনের শেষে একটা না-ক্লান্ত সন্ধ্যা সে উপহার দেবে সবিতাকে। জ্যোৎস্নায় দু'জনের সিল্যুয়েৎ স্পর্শ করবে এই মীনগর্ভের শিরদাঁড়া তার অন্ধকার শরীরের শীতলতা। কিন্তু হয় না। অনির্বাণ স্পষ্ট দেখতে পায় তার হাতে কে যেন একটা দস্তানা চড়িয়ে দিয়েছে।

যখনই সবিতা কথা শুরু করে শুধুই সংসার, বিয়ের পর কী কী করবে সে তার তালিকা। কিছুদিন আগেও ছিল পার্টির কথা এখন শুধুই সংসার। তারা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অনির্বাণ সবিতাকে তার বাড়ির সামনে ছাড়ার সময় স্পষ্ট দেখে তার ছোটবেলার নিমগাছটায় আর একটাও পাতা নেই। প্রত্যেকটা ডালে ছোট ছোট অ্যালুমিনিয়ামের বাসন ঝুলছে। জ্যোৎস্নায় আরও শীতল তাদের ঔজ্জ্বল্য। হাওয়া দিচ্ছে আর মৃদু শব্দে সচেতন হয়ে উঠছে অনির্বাণ। কিন্তু ততক্ষণে ফ্যাকাশে সাদা আলো ও বাসনপাতার গাছ আরও বড় হয়ে উঠেছে। অনির্বাণ জোরে সাইকেল চালাতে থাকে। কী আছে সামনে? এক অনন্ত লম্বা রাস্তা—কৃত্রিম আলোহীন—শুধু ফ্যাকাশে সাদা— আর দু'পাশে ক্রমশ বেড়ে উঠছে বাসনপাতার গাছ তাদের পাতার শব্দ। বিকট। অনির্বাণ কান চাপা দেয়। আর ব্যালেন্স হারিয়ে সাইকেল থেকে পড়ে টের পায় জিভে নোনতা স্বাদ। হাত-পা ছড়ে কেটে বিশ্রী দশা। খুব জোরে লেগেছে কি? সে বুঝতে পারছে না। সাইকেলটা একটা গাছে ধাক্কা মেরেছে। চাকাটা কি বেঁকেছে? কিছুই বুঝতে পারছে না অনির্বাণ। বুক পকেট হাতড়ে সিগারেট বের করে সে। পেট্রোল লাইটারের তীব্র গন্ধে সে নিজের অসহায়তাকে শক্ত করে চেপে ধরে। আগুন ধরায়।

কী আছে এই সময়টায়? যে অনির্বাণ একদা ছুঁতে চাইত এই না হতে পারা শহরের গ্রীষ্ম বিকেলের শিহরন কেন সে পালাতে চাইছে? কেন মনে হচ্ছে এই গ্রীষ্ম দুপুরের দীর্ঘ হলুদ স্তম্ভের মতো শরীরটাকে ভেদ করা যাবে না—সে নিজে একদিন ঢুকে যাবে এর শরীরে। আটকে যাবে। সে তো এখন লিখতে পায়। শুধু খবরের কাগজের পাদপূরণ নয়। রঙিন খবর, ছায়াবাণী নামক সিনেমার কাগজগুলোতে মাঝে মাঝে গল্পও বেরোয়। তাহলে কেন তার ভাল লাগছে না? এই তো একটা রবিবার সেই জমিদার বাড়ির জঙ্গলে গিয়েছিল সে বিকেলের মুখে। বহুদিনের সঙ্গী রঞ্জিত পাশে। সরকারের প্রবল চাপে যখন পার্টি করাকে জীবনের আশঙ্কা বলে মনে হচ্ছে তখন এই বাগান হয়তো একটু স্বস্তি দেবে। এই ভেবে আসা। "মনে আছে সেই গাঙ্গুবাই-এর মারা যাবার পরের সপ্তাহের কথা?" রঞ্জিত বলে, "বাব্বা। সেই স্বরলিপির স্তূপ।" আজ আর সেই বাড়িটার রহস্য নেই। রিফিউজিরা দখল নিয়েছে। জমিদার বাড়ির বুড়ো সলিল রায়চৌধুরি ছাড়া মূল বাড়িটাতেও কেউ থাকে না। দু'একজন চাকরবাকর ছাড়া। বাকিরা কোথায় যে গেছে! এখানে এলে একটা দৃশ্যই স্পষ্ট দেখতে পায় অনির্বাণ। আলোমামা আর সেজদি। এখনও গায়ে শিহরন হয়। কোথায় এখন আলোমামা? সেজদি চলে যাবার পর প্রবল মদ্যপান শুরু করে। তারপর একবার গঙ্গাসাগরের মেলায় গিয়ে আর ফেরেনি। অনির্বাণও কি সেরকম চলে যাবে? কোথায় যাবে? কেনই বা যাবে? আবার মাথার ভিতর বাসনবৃক্ষের নড়াচড়া টের পায় অনির্বাণ। কিন্তু কিছুই হয় না। গল্প ছাপার লোভ আর কী যেন একটা সামাজিকতার জোরে সে আর সবিতা বিয়েটা করেই ফেলে। কেন বিয়ে করে লোকে? সামাজিকতার মোহে? মাংসল উপস্থিতির জন্য? সঙ্গের জন্য? কতদিন সামান্য মাংসের লোভে জিভ লকলক করে উঠেছে কুকুরটার আর তারপরেই ভারী বুটের লাথি। জিভ দাঁতে বিঁধে গিয়েছে। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। পরিত্রাহী চিৎকারে ভেসে গিয়েছে শরীর ও মন। আর কিছু আছে না কি মন বলে? বিয়ের প্রথম কয়েক মাস কিছুই লিখতে পারেনি অনির্বাণ। না, কোনও বিবাহজনিত সামাজিকতা নয়, কীভাবে যেন সময় চলে যেত। রোজ অফিস আর বাড়ি ফিরে আঁচ দেওয়ার গন্ধে ভরে থাকা সবিতা—এই তো দিনযাপন। খবরের কাগজগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ অটুট থাকলেও লেখা হয় না। পুজোসংখ্যা কেনে সে বিশেষ ছাড়ে, স্টাফ ডিস্কাউন্টে। কিন্তু নিজে চান্স পায় না। কিন্তু আশ্চর্য লাগছে তাতে শুধু সিগারেটের সংখ্যা বাড়া ছাড়া আর কিছুই হয় না। রোজ নিজেদের মধ্যে প্রবল আবেগ ভরা শরীরদলন সেরে যখন ক্লান্তি ছড়িয়ে আছে প্রতিটি শিরায়—তখনও সিগারেট। সবিতা বলে "কেন এত সিগারেট খাও। এবার ছাড় ওটা।" অনির্বাণ কিছু বলে না। রোজ সকালে সে ঘুম থেকে ওঠে বেলায় সূর্য ওঠার পরে।

আঁচ ওঠার পরে। তাদের এক কামরার ভাড়াবাড়িতে বারান্দায় আঁচ দেয় সবিতা। কয়লার গন্ধ নাকে আসার পর ঘুম ভাঙে তার। কিন্তু আগের দিন কি সে গভীর রাতে শুয়েছিল? না। শুয়েছিল আগে কিন্তু ঘুম ছিল না। উঠে পড়ত সে। কেন? ডায়েরিতে কিছু কথা লিখত সে। রাজনীতি দল সবই কোথায় যেন চলে গিয়েছে। সবিতা এখনও যায়। তবে সাবধানে। অনির্বাণ বুঝতে পারছে না কেন সে এমন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। সে তো লিখতেই চেয়েছিল। কিন্তু পারছে না। কেন? এলোমেলো কথা লেখে ডায়েরিতে। নিজের স্বপ্ন লেখে। অধীরদা ফ্রয়েড পড়তে দিয়েছিল। জীবনানন্দ দাশ। মাথায় ঢুকে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। বিনয় মজুমদার। আল মাহমুদ। কিন্তু তার নিজের লেখা? সবিতাকে আল মাহমুদ শোনাবার চেষ্টা করেছিল বিয়ের পরপর। বোঝাতে চেষ্টা করেছিল দেহজ ভালবাসার গুরুত্ব। সবিতাও বোঝেনি। সেদিন রাতে সে স্পষ্ট দেখেছিল সবিতা মিলিত হচ্ছে প্রবল আক্রোশে। আর বারবার মা হতে চাইছে। সবিতার স্তন ভারী হয়ে উঠছে আর জোর করে ঠেসে দিচ্ছে অনির্বাণের মুখে। অনির্বাণ ডায়েরিতে নোট করেছিল। তার কি মনে হচ্ছিল না তাদের শরীর দুটো শুধুই প্রয়োজনে মিলিত হচ্ছে? যে দেহ কামনা করে শিহরিত হত সে সেটা কি এখন শুধুই প্রয়োজন? ডায়েরির পুরনো পাতায় দেখে লেখা আছে "সবিতা আজ ছায়ার মতো বড় হয়ে উঠেছিল—ছড়ানো চুল ও বিকট ঠেলে থাকা পেট নিয়ে আমাকে ঢেকে দিয়েছিল। আর একদিন লেখা : "অনেক পোয়াতি মেয়ে একসঙ্গে রাস্তা দিয়ে একটা নদীর দিকে চলেছে। নদীর পাড়ে তাদের পুরুষেরা দাঁড়িয়ে আছে। আমি আর সবিতাও আছি। পাশে একটা মর্গ আর সিভিল কোর্ট। দুটো বাড়ি থেকেই আমার বাবার লাশ বেরিয়ে আসছে। পোয়াতি মেয়েরাই বের করে আনছে। মাথায় হাত বুলোনোর স্পর্শে চোখ খোলে অনির্বাণ। মুখে ঠাণ্ডা লাগছিল। টেবিল ফ্যানটা মাথার কাছে রাখা। প্রথমে বুঝতে পারেনি সে কোথায় রয়েছে। আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়েছে সবিতার মুখ। ঘরে আলো জ্বলছে কম পাওয়ারের। "জানলাটা একটু খুলে দেবে?" সবিতা উঠে জানলা খুলে দেয়। বাইরে আলো ফুটছে। উঠোনের গন্ধরাজটা যে ফুলে ভরে আছে তার প্রমাণ হল স্নিগ্ধ গন্ধ। সবিতা ফিরে বিছানায় বসে ফের মাথায় হাত বুলোতে লাগে। "বাজে স্বপ্ন দেখছিলে?" "হ্যাঁ।

দেখলাম বাবার অনেকগুলো মৃতদেহ। আর নানা বয়সের পোয়াতি মেয়েরা তাকে বয়ে আনছে।" "এত ভেব না। চা খাবে?" অনির্বাণের হঠাৎই খুব মায়াবী মনে হল সবিতার মুখটা। এরপর ঘটনা আর বেশিদূর এগোয়নি। এমারজেন্সি ও তার চাপে খবর কাগজগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। এদিকে, সবিতা পুরোদমে নেমে পড়েছে পার্টির কাজে। গোপনে। ঘরে-ঘরে জ্বালাময়ী ভাষণ আর সংগঠন এই তো কাজ। অনির্বাণ অফিসেও সংগঠন করছে জোরদার। তবে সবই গোপনে। দেশটা বদলাবেই। জরুরি অবস্থা যাবেই এই বিশ্বাস সকলের মধ্যে আছে। কিন্তু অনির্বাণ লক্ষ করছে তার লেখার স্পৃহা দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে। কেন? একসময় ভাবত শান্তির চাকরি পেলে লিখবে। তারপর ভেবেছিল সুযোগ পেলে লিখবে। সবই তো হল। কিন্তু লেখা হচ্ছে না কেন? রোজ অফিস থেকে ফিরে আড্ডা হয় না আজকাল। রঞ্জিত আর নির্মলদা ব্যস্ত সংগঠনের কাজে। নির্মলদা জেলেও গিয়েছিল মাঝখানে। সামনে যে কী আছে তা কেউ বলতে পারে না। অনির্বাণ একটা রেকর্ড প্লেয়ার কিনেছে। বাবার প্রিয় গানগুলো লং প্লে রেকর্ডে শোনে সে। মা ও দিদিদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক না হলেও বাড়িতে সে যায়। মাঝে মাঝে টাকাও দেয়। একটা প্রাথমিক স্কুলে চাকরি পেয়েছে মেজদি। গোটা পরিবারের এতদিনের শাসকদল প্রীতির পুরস্কার হিসাবে। শনিবার বিকেলটা অনির্বাণ গান শুনেই কাটায় আজকাল। দুপুরবেলা অফিস থেকে ফিরে মুখ্যত শচীনদেব, তবে কখনও সলিল চৌধুরিও শোনে। পান্নালাল। কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়। স্পষ্ট মনে আছে সেই শনিবার বিকেল ৪.৩০। বান্ধবহীন গান শোনার শচীনদেব বর্মন। সিগারেট। এখন দিনে ২৫ বা ৩০ টা। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক অফিস ফেরত ভুলে গিয়েছে অনির্বাণ সিগারেট আনতে। নিশীথে যাইও ফুল বনে নামক হিট গান চলার সময় তার খেয়াল হয়েছিল আর সিগারেট নেই। বিয়ের ১$^{১}/_{২}$ বছর অবধি যখন কোনওদিন সবিতার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তা অনুভূত হয়নি, আজ তা হল। মনে হল কেন সবিতা নেই। পার্টি আর সংগঠন ছাড়াও তো আরও কিছু হয়। আছে। অনির্বাণ বেরিয়ে পড়ে সাইকেল নিয়ে। এই ভাড়া বাড়িটা অদ্ভুত। একটা বড় বাড়ি। তার পিছনে মস্ত উঠোন। সেই উঠোনের প্রান্তে আবার লম্বাটে স্কুল বাড়ির মতো দু'টো করে মোট চারটে ঘর। কমন বাথরুম উঠোনে। অনির্বাণের পাশের ঘরটায় কেউ থাকে না বলে বাথরুম ভাগ করে নিতে হয় না। অনির্বাণ সাইকেল সমেত হাঁটতে হাঁটতে উঠোন পেরোয়। মূল বাড়িটার পাশ দিয়ে এসে রাস্তায় পড়ে। এই পাড়াটা ছোট শহরের বাইরে। এখান থেকে ১$^{১}/_{২}$ কিলোমিটার গেলে তবে ছোট শহরের কেন্দ্রে পৌঁছনো যায়। অনির্বাণ শহরের দিকে না গিয়ে উল্টোদিকে সাইকেল চালানো শুরু করে। কোনওদিন আসেনি এদিকে। অক্টোবরের আলো ঝকঝকে। বেশ খানিকটা সাইকেল চালানোর পর যখন চারদিকে ফসলের খেত ছাড়া আর কিছু নেই তখন সেই খেতের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া চওড়া একটা মাটির রাস্তা ধরল সে। নিজের ডানদিকে। টানা ২০ মিনিট সাইকেল চালানোর পর একজনও মানুষের দেখা না পেয়ে যখন সে প্রায় ভীত তখন দেখল সে শহরের চেনা দক্ষিণ প্রান্ত। গাছে নুয়ে থাকা পার্ক। ঢুকে পড়ল সে। সাইকেল রেখে তীব্র নৈঃশব্দ্যের শরীরে একটা বেঞ্চে বসল। আর তারপরেই নজর গেল সামনের দিকে। একটা পেয়ারা গাছ ঝড়ে পড়ে যাওয়ার পর মাটিতে শায়িত অবস্থাতেই জীবিত আর তার উপর বসে আছে অন্তত ১০ জন বালক। নিঃশব্দে শামুকের মতো পাতা ছিঁড়ে চলেছে তারা। কাউকে ভ্রূক্ষেপ করছে না। এরপর কয়েকটা দিন অনির্বাণ ঘুমোতে পারেনি আবার সুস্থভাবে। কিন্তু শরীরে কিছু একটা ঘটছিল। অফিস ফেরত সন্ধেবেলা সে যখন অভ্যস্ত চা-সিগারেট ও রমাপদ চৌধুরি নিয়ে বসেছে তখন সবিতা গা ধুয়ে এসে কাপড় পরছে। অভ্যস্ত শরীর হলেও অনির্বাণের চোখ আটকে গেল। ভারী হয়েছে স্তন। ব্রেসিয়ার ছাড়ার সময় অভ্যস্ত পিছন ফিরেছে সবিতা। কোমরে মেদ। ফর্সা পিঠটা ফুটে উঠেছে। অনির্বাণ চকিতে উঠে গিয়ে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে সবিতাকে। ব্লাউজহীন শাড়ির তলা দিয়ে হাত ভারী স্তনে। ঘুরিয়ে নেয় সে সবিতাকে। তারপর তীব্রতম চুম্বনে যখন ঘাম নামছে শরীর জুড়ে তখন এক আশ্চর্য নির্বেদ।

এই দিনের পরে সবিতার গর্ভ নিশ্চিত হয়।

দশ

কোনওভাবেই আবেগকে থামিয়ে রাখা যাচ্ছিল না। কেমন একটা নিশ্চিত অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি শরীরে। গর্ভের আগমনে যেমন সবিতার। অথচ গোড়ায় সবিতা খুশি ছিল না। রাজনৈতিকভাবে সেটা কিছুতেই মা হওয়ার সময় নয়। বহু কষ্টে বোঝানো গিয়েছিল তাকে। যদি ক্ষমতায় আসে দল তাহলে এই সময় মা হওয়া ভীষণই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। নির্মলদা বা রঞ্জিত বা অনির্বাণ নিজে কি নিশ্চিত ছিল না নির্বাচনে জেতার ব্যাপারে? কিন্তু এই আবেগের সঙ্গে কিছুতেই মেলানো যাচ্ছিল না সবিতার স্থবিরতা। সবাই প্রবল উদ্যমে কাজ করে চলেছে আর সবিতা নিশ্চুপ। শুধু জেতার রাতটা শরীরে মেখেছিল তারা। সবাই। বিজয় মিছিলে হাঁটা সম্ভব হয়নি সবিতার কিন্তু তার জন্য অনির্বাণও যায়নি। দু'জনে তাদের আগত সন্তানের সঙ্গেই যাপন করেছিল বিজয়। ২২ জুনের খবর কাগজ দেখে সত্যি শিহরন টের পেয়েছিল অনির্বাণ। কালো চৌকো ফ্রেমের চশমার আড়ালের নেতার মুখই। দেখে কি সম্ভ্রম জেগেছিল? এতদিনের যে অত্যাচার, এত কাটা মাথা, এত রক্ত এবার বুঝি জুড়োবে। নেতার আবেগহীন দায়িত্বজ্ঞানী কণ্ঠ তাকে আরাম দিচ্ছিল। যতবার দেখেছে সেই শপথের ছবি আলোড়িত হয়েছে সে। তারা। তাদের সন্তান এক নতুন দুনিয়ায় আসবে। দুনিয়া কি নতুন হবে? হবে কি হবে না তাই নিয়ে ভাবার সময় ছিল না কারওরই। অনির্বাণই না লেখার অকারণ এবং বিজয়ের কারণ হেতু উত্তেজনা এবং সন্তানের আগমন যে কোন দিকে ঠেলে দিচ্ছিল তাদের তার কোনও পূর্ণ ব্যাখ্যা নেই। গোটা বাংলা কাঁপানো বিজয় মিছিল ও তার ব্যাপক উচ্ছ্বাস অনির্বাণ মনে রাখে শান্ত নির্মলদার গুলতি দিয়ে পাখি মারা দেখে। এতদিনের শান্ত মেধা উসকে দেওয়া নির্মলদা ২৭ তারিখ বিজয় মিছিল থেকে উচ্ছ্বাস নিয়ে এসে যখন ছড়িয়ে দিচ্ছিল বাকিদের শিরায় অদ্ভুতভাবে তার হাতে ছিল একটা কিশোরদের হিংস্রতার অস্ত্র গুলতি। প্রবল উত্তেজনায় ফটফট করে কয়েকটা আকাশের দিকে তাক করে ছুড়েও দিল সে। গাছে বসে থাকা একটা ডাক পাখি পড়েও গেল সে আঘাতে। অযথা মৃত পাখিটার পাশে কারও চোখ ছিল না। অনির্বাণ দেখেছিল দিনের কাগজ ও তার ছবি নিয়ে মাতোয়ারা বিশেদার দোকান ও তার সামনে গাছতলায় রক্তহীন মরে থাকা ডাকপাখি তার সাদাকালো রং। জুলাই-এর ১১ তারিখ বিনা জটিলতায় জন্মেছিল অনির্বাণ ও সবিতার একমাত্র সন্তান। কন্যা। নির্মলদা বহুদিন তাকে আদর করে তাতিয়ানা বলে ডেকেছে। এই নামটাই চলছিল শুধু ছোট শহরের কৌতূহল চেপে রাখতে বসিয়ে দেওয়া হয় শ্রেয়া। অদ্ভুতভাবে এই সময়টায় অনির্বাণ কোনও স্বপ্ন দেখেনি। অন্তত তা লিখে রাখা নেই। আরও অদ্ভুতভাবে সে লক্ষ করেছিল মেয়ের প্রতি টান সেভাবে জন্মাচ্ছে না। মেয়ে আস্তে আস্তে আকার নিচ্ছে। চামড়ার লালভাব কাটছে। মাথায় চুল গজাচ্ছে। সবিতা সবকিছু ভুলে মেয়ে পালনেই মজে আছে। কিন্তু অনির্বাণ তেমন কিছু টের পাচ্ছে না। হচ্ছেও না। এই সময় শুধুই বাহ্যিক। শুধুই বহির্মুখী। এই পার্টি অফিস, এই মিছিল—এই উদ্বাস্তুদের নিয়ে সভা। অনির্বাণের ভাল লাগছে আবার এই জমায়েত। সে যে লিখছে না তা মাথার মধ্যে খোঁচা মারলেও জ্বালা ধরাচ্ছে না। "কাঙ্ক্ষিত ঘটনাময় জীবনে কি লেখা আসে না?" নির্মলদাকে প্রশ্নটা করতেই খ্যাক

করে উঠলেন। "যত সব ভাববাদী কথাবার্তা। তোদের এইসব ন্যাকামি পার্টির ক্ষতি করতে পারে। কাজের ক্ষতি করতে পারে। এখন সামনে অনেক কাজ।" বলেই হাতের গুলতিটা থেকে একটা অনির্দিষ্ট ঢিল ছুড়ে দিলেন গাছটার দিকে। অনির্বাণ প্রথমদিন এই গুলতিটা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল। পরে জেনেছে সবুজপুরে ক্যাম্প করার সময় স্থানীয় এক কিশোর শকুন তাড়াতে ওটা নির্মলদাকে দিয়েছিল। এবং নির্মলদা সেটা তারপর থেকে হাতছাড়া করেনি। শিশুর খেলনার মতো হাতে রেখে দিয়েছে। সুযোগ মতো পাখি মারে—একটা দু'টো। বাকি সময় চুপচাপ। সময়টা যে কীভাবে যাচ্ছিল। অনির্বাণ দেখছে কীভাবে তার মাথা থেকে চলে যাচ্ছে লেখার ইচ্ছে তার জায়গায় বসছে, আবার নতুন করে, পার্টির কাজ। বাড়িতে সবিতা, ছোট্ট শ্রেয়া তার আধোবোল অথচ সবকিছু টপকে যাচ্ছে পার্টি আর টান। কত কাজ। এই তো সেদিন মুখ্যমন্ত্রী কড়া চিঠি লিখে জানান দিলেন উদ্বাস্তুদের ফেরত আনতে হবে বাংলায়। আর সেই মতো কাজ শুরু করে দিল অনির্বাণরা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিঠির বয়ানে জানিয়েছেন কীভাবে কোন ব্লকে কতজন, উদ্বাস্তুকে রাখা হবে। তাদের ছোট শহরেও একটা এলাকা বেছে নেওয়া হয়েছে। আর সেখানেই চলছে পার্টির তদারকি। আজকাল রঞ্জিতও একটা গুলতি রাখছে কাছে। একটা জংলা এলাকা কেটে সাফ করে রাখা হচ্ছে যাতে উদ্বাস্তুদের নতুন করে বিশেষ ঝামেলা পোয়াতে না হয়। আর রঞ্জিত সে কাজের তত্ত্বাবধানের জন্যই হাতে গুলতি রাখছে। বেয়াড়া জন্তু-জানোয়ার তাড়ানোর জন্য। পার্টির নেতাদের মধ্যে এক অলিখিত ড্রেস কোড চালু হয়ে গিয়েছে। ধুতি-পাঞ্জাবি আর চশমা থাকলে কালো মোটা ফ্রেমের চৌকো চশমা। নির্মলদা অবশ্য তা পরে না। নির্মলদা প্যান্ট পরে। পকেট থেকে উঁচু হয়ে থাকে গুলতি। সেই ১৯৬১ সালে পার্টির নেতা থাকাকালীন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী চিঠি লিখেছিলেন উদ্বাস্তুদের নিয়ে আসার ব্যাপারে। এখন তাকে সাকার করার সুযোগ।

ভোটে বিপুল জেতার স্বাদ পাওয়ার পর থেকে আর আবেগ ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। মানুষ ও তার আবেগ। অনির্বাণ আজকাল শুধুই গণসঙ্গীত শোনে। লেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে জাগে না। পথে এবার নামো সাথী শুনে প্রবল উত্তেজনায় অফিস যায়। সংগঠন সাজায় কর্মীদের। বাড়ি ফিরে সদ্য কথা ফোটা মেয়ের সঙ্গে একটু সময় কাটিয়েই চলে যায় পার্টি অফিস। শোনা যাচ্ছে দণ্ডকারণ্য থেকে উদ্বাস্তুরা আসছে। এই সময় শুধু একটা স্বপ্নই লিখে রেখেছে অনির্বাণ। উদ্বাস্তুদের জন্য তৈরি করা জায়গাটায় একটা গানের আসর হচ্ছে। বাবা গান গাইছে। দর্শকরা সবাই ধুতি-পাঞ্জাবি পরা। পাঞ্জাবির পকেট থেকে গুলতি উঁকি মারছে। অনির্বাণ বুঝতে পারছে না কেন সে এতটা জড়িয়ে পড়ছে পার্টিতে। অথচ তার ভাল লাগছে। সে তো পার্টি করতে চায়। কিন্তু লেখা নিয়ে বিন্দুমাত্র অনুভূতি নেই কেন? লেখাহীনভাবে বেঁচে থাকার নামই কি পার্টি? নাকি সামাজিক হয়ে গেলে লোকে লিখতে পারে না? সেজদি আজকাল খুবই বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। অনেক জায়গায় নাম শোনা যাচ্ছে। একটা লং প্লেও বেরিয়েছে। কিন্তু সেজদি প্রত্যক্ষ পার্টি করে না। বাবাকে কোনওদিন কোনও সামাজিক সংসর্গে দেখেছে বলে মনে পড়ে না। মা তুলনামূলকভাবে সামাজিক। মায়ের কোনও শিল্প নেই। থাকারই বা কী দরকার? অনির্বাণ মনে মনে বলে নির্মলদাকেও বলে। "সে কি তুই বলছিস এ কথা! তুই তো লেখা ছাড়া বাঁচবি না বলেছিলি।" "হ্যাঁ, কিন্তু এখন দেখছি লেখা ছাড়া বাঁচা যায়।" "একশোবার যায়। আমাদের কাজ শুধু টেবিলে বসে আয়না দেখা নয়। তার চেয়ে বড় কিছু করা।" অনির্বাণ মজে যায়। এমনিতেই লেখা হচ্ছে না। ইচ্ছে করছে না। শুধু "হচ্ছে না" এই বোধটা ছাড়া তেমন কিছু নেই। সে ফিরে আসে রোজ, বাড়িতে, লেখার জায়গায়, কিন্তু কোনও অনুভূতি হয় না। ভাবে কিন্তু হয় না। এবং তার জন্য কোনও আফসোস, মারাত্মক বেদনাবোধ. তেমন কিছুই হয় না। শুধু পার্টির কাজের জন্য উত্তেজনা বাড়ে। সেই কবে অধীর বাগচি বলেছিল, "লেখার ভূত একবার কামড়ে দিলে শত সাফল্য জীবনের শত দিক থেকে ঘিরে ধরলেও, যদি লেখায় ব্যর্থ হও তাহলে তা তাড়া করে বেড়ায়।" অনির্বাণের লেখক হিসাবে সফল হওয়ার কি সম্ভাবনা ছিল? সে বুঝতে পারে না। শুধু এটুকু টের পায় অনেক কিছু কাঙ্ক্ষিত একত্র হলে লেখার সেই তীব্র ইচ্ছেটা সাইকেলে আসতে আসতে শুধু এটাই ভাবছিল সে। পার্টি ও তার কাজ। মানুষের কাজ, মানুষের জন্য উন্নততর কিছু ভাবা সেটার সঙ্গে লেখা নামক কাজটার কি সরাসরি বিরোধ আছে? লেখা কী? বাড়িতে সাইকেলটা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে বাসন পড়ার আওয়াজ হল। সবিতার গলার স্বর তীব্র হচ্ছে। পাশ থেকে শ্রেয়ার কান্নার আওয়াজও আসছে। অনির্বাণ রান্নাঘরে পৌঁছে স্তম্ভিত হয়ে যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার দিকে একটা অ্যালুমিনিয়ামের থালা ছুটে আসে। সে কোনওক্রমে সামলে নিতেই। "তোমাকে আমি ছাড়ব না। আজ তোমায় উত্তর দিতেই হবে।" "কীসের?" "মেয়েটা কি একা আমার? নাকি আমি জোর করে তোমায় বাবা হতে বলেছি?" "কী বলছ এ সব?" প্রচণ্ড আক্রোশে কাঁপতে থাকা সবিতা মুখ দিয়ে বিকট আওয়াজ বের করে ঘরের দিকে চলে যায়। কোলে প্রবল ক্রন্দসী শিশু। অনির্বাণ অবাক হয়ে ভোঁদা দাঁড়িয়ে থাকে। ১০/১২ সেকেন্ড। তারপর ঘরে গিয়ে "কিন্তু আমি কী করেছি?" "তুমি কিছু করছ না এটাই আমার কথা।" "কী করা উচিত?" "দেখ মেয়েটা আমাদের দু'জনের। আর তোমার চেয়ে পার্টিটা আমি ভাল বুঝি। অনেক বেশি করে যুক্ত। শুধু একটা ছোট ভুলের জন্য আজ আমি এখানে।" "কী বলছ তুমি সবিতা? ভুল মানে?" "মানে মা হওয়া।" "মেয়ের সামনে এরকমভাবে বোলো না।" "হায় রে বাবা আমার! মেয়ের যদি এসব বোঝার ক্ষমতা থাকত।" "তবুও, তুমি এসব বলবে কেন?" "না বললে তুমি শুনবে? তুমি বুঝবে?" "আমায় কী করতে হবে বল, অশান্তি ভাল লাগছে না।" "এখন কাজ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, তাই না?" অদ্ভুত একটা তির্যক হাসি হাসছে সবিতা। "কিন্তু কিছু তো একটা করতে হবে।" "তুমি কি বোঝ আমার উপর দিয়ে কী যাচ্ছে?" "শোন সবিতা, আমি অফিস থেকে এসে এবার থেকে মেয়ে দেখব তিনদিন। তুমি সেই তিনদিন পার্টির কাজ করবে। বাকি ক'দিন আমি যাব পার্টির কাজে।" "বাহ, এখানে বিভাজন। সপ্তাহে দিন সাতটা। আর তুমি তিনদিন বাচ্চা দেখবে। আমি চার! বাহরে বাবা! বাহ্ বাহ্।" "তুমি কি পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করবে?" এই কথাবার্তা আর বেশিদূর গড়ায়নি। যে কোনও বিয়ের মতো বোঝা আর সে ভার বোঝার জন্য অলীক পাঠ পড়া—এই নিয়ে অদ্ভুত জোড়াতালি দিয়ে চলে যাচ্ছিল ওদের দিন। অনির্বাণের বড়দার কংগ্রেসি যোগ থাকার কারণ দেখিয়ে মাঝখানে কিছুদিন পার্টিতে গোলমাল হলেও সবিতা ও অনির্বাণের নিজের নথি দেখিয়ে ছাড়া পাওয়া গেছে। অনির্বাণ নিজেই লজ্জিত ছিল ওর দাদার কংগ্রেসি গুণ্ডাদলের সঙ্গে যোগ থাকায়। উল্টোদিকে অবশ্য সেজদির সাংস্কৃতিক মঞ্চে পার্টির সঙ্গে যোগও কারও অজানা নয়। কিন্তু এইসব ছোটখাটো গোলমালকে ছাপিয়ে উঠল হাজারে হাজারে উদ্বাস্তুর আগমন। এতদিনের প্রস্তুতি যেন শেষ হল। সারা রাজ্যে কোথাও এমনভাবে আগে থেকে প্রস্তুত করা শিবির ছিল না। সবাই জড়িয়ে যাচ্ছে, বা গেছে। সবিতার ভাই যে কি না এতদিন উদাসীন ছিল এই সব কিছু নিয়ে সেও নেমে পড়েছে। কেমন যেন তীব্রতর হয়ে উঠছে দিন। ৪/৫ মাসের মধ্যে তাদের তৈরি করা কলোনি ভরে উঠল। কিন্তু তবু লোক আসা থামছে না। নির্মলদা এখন প্রায় মিলিটারি জেনারেলের মতো। শৃঙ্খলায় কঠোর। অস্ত্রে সজ্জিত। যে আগে প্রশ্রয় দিত প্রথাবিরোধী পথে হাঁটার জন্য। এখন সে বলে পার্টিই শেষ কথা। নেতৃত্বই শেষ কথা। মুখ্যমন্ত্রী শেষ কথা। তাতেও কোনও অসুবিধা ছিল না। সবকিছুই জানা ছিল। পরিকল্পিত ছিল। এ দেশে কোনওদিনই সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে না বিপ্লবের মারফত।

গণতন্ত্রই ভরসা। যা নির্দেশ আসে ওপরতলা থেকে তাতে স্পষ্ট সমস্ত জায়গায় সমস্ত অফিসে, সমস্ত স্কুলে-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, মাঠে-চাষে, জমিতে পার্টির উপস্থিতি দরকার। অনির্বাণ জানে কীভাবে তাকে অফিসে পরিশ্রম করতে হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি করতে। সকলেই লড়ছে। নানা ফ্রন্ট খুলে গিয়েছে যুদ্ধের। যুদ্ধ তো ছিলই, এখন ক্ষমতায় আসার পর দায় ও দায়িত্ব বেড়েছে। যাতে ক্ষমতা সুনিশ্চিত হয়, যাতে মানুষ নিশ্চিন্তে ভোট দেয় তা দেখা তো পার্টিরই কাজ। গণসংগঠনের কাজ। নির্মলদা বলেন, "অনি তুই লেখাটা চালিয়ে গেলে তোকে লেখক সমিতির শহর প্রধান করে দিতাম। কিন্তু তুই ...যাক, যা করছিস ভালই করছিস। এখন আমাদের শুধু ভাবুক হলে চলবে না।" অনির্বাণ বুঝতে পারে না। কেমন একটা অসাড় লেখার দিকটা। বিয়ের পর থেকে একটু একটু করে কমেছে লেখার চাহিদা। শুধু 'না লেখা' বোধটা আছে। সে তো খুব সংসারী হয়নি। বাবার বাড়ি তো আগেই গিয়েছিল, শ্বশুরবাড়িও তেমন আপন হয়নি। সে নিজেই হতে দেয়নি। পার্টি আর সংগঠন আর মেয়ে—বস্তুত সবিতার সঙ্গে যৌনতা ছাড়া আর কোনও যোগ এখন নেই। সেও কেমন নিতান্ত জৈবিক বলে মনে হয়। কতবার কতরকমের অপমানের পরেও দু'জন দু'জনকে খুবলে চলেছে। তবে নিশ্চিত যে আর তারা বাবা-মা হবে না। শ্রেয়া বড় হচ্ছে আর বাঁধন বাড়ছে। অনির্বাণের ভাল লাগছে। সে মেয়ের জন্য ছড়ার গানের রেকর্ড কিনে এনেছে। গানটা কি রক্তে থাকেই? না কি ব্যক্তি বিশেষে ছাপ থেকে যায়? অনির্বাণ দেখেছে অন্যান্য বাচ্চার চেয়ে শ্রেয়া গানে বেশি সাড়া দেয়। নির্মলদা বলেন, "রক্ত নয়, অভ্যাসই শেষ কথা। পরিবেশই বাচ্চাকে তৈরি করে। তুই ওই কলোনির ভোলাকে ছোট থেকে গান শোনা, দেখবি ও-ও..." বলে কলোনির সদ্যোজাত এক শিশুকে দেখান। কে জানে ওর নাম ভোলা কি না! কলোনি বেড়ে উঠছে শ্রেয়ারই মতো। লোকে বিড়ি বাঁধার কাজ করছে। মাছ বিক্রি করছে। অর্থনীতি তৈরি হচ্ছে।

নির্মলদা কেমন যেন আদিবাসী সমাজের মাথার মতো এই কলোনিটার প্রধান হয়ে উঠছে। পার্টির জন্য বরাদ্দ ঘরটায় বসে অলস দুপুরে যে বাচ্চাদের গুলতি মারা শেখায়। রঞ্জিত প্রধান শাগরেদ। সে কলোনির সমস্ত খবর জানে। কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ অবস্থানের ভিত নড়িয়ে দিল পার্টির ওপরতলার চিঠি। "কলোনিটা তুলে দিতে হবে।" "কী বলছ নির্মলদা?" "হ্যাঁ, ওপর থেকে নির্দেশ এসেছে এদের আবার দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠাতে হবে।" "কী করে পাঠাবে?" "জানি না।" নির্মলদা খানিকটা অসহায়ভাবে বলেন। শ্রেয়াকে কোলে নিয়ে পার্টি অফিসে আসা সবিতা বলে, "কী করে সম্ভব হবে সেটা?" "ভাবছি, তবে পার্টি থেকে বলেছে পরে বিস্তারিত নির্দেশ আসবে।" নির্দেশটা এসেছিল ঠিক ৩০ দিন পর। প্রবল বর্ষণ ও বন্যার পর তখন সবে স্থিতু হচ্ছে কলোনি ও ছোট শহর। কনভেনশন ফেরত অনির্বাণ শ্রেয়াকে সামলাচ্ছে ঘরে আর সবিতা পার্টি অফিসে। নির্মলদা আশ্চর্য উদাস মুখে বসে আছে। মুখ্যমন্ত্রীর সইসহ চিঠি ঘুরছে চারজনের মধ্যে। ২১ আগস্ট পুলিশ ঘিরে ফেলবে কলোনি। কারণ, এখানে কলোনি করা বেআইনি। পুলিশ গ্রেফতার করতে পারে কারণ, এর আগে উচ্ছেদ নোটিস পাঠানো হলেও লোকে তা মানেনি। হঠাৎ সবিতা বলে ওঠে কবে এল এ নোটিস?" "এসেছিল কিন্তু নির্মলদা সেটা দিতে দেয়নি" রঞ্জিত বলে। "কী বলছিস তুই?" নির্মলদা এটা সত্যি?" "মিথ্যে নয়। তবে এর পিছনে কারণ ছিল।" নির্মলদা নির্বিকারভাবে উত্তর দেয় "কিন্তু এখন কী হবে?" "যা হওয়ার তা হবে।" নির্মলদা সবিতাকে থামিয়ে দেন। সবিতা যখন উত্তেজিতভাবে এই ঘটনার বর্ণনা করছিল অনির্বাণের কাছে, তখন অনির্বাণের সামনে বালিশ আঁকড়ানো ছাড়া আর কোনও রাস্তা ছিল না। "কিন্তু আমরা চেয়ে চেয়ে দেখব পুলিশ অত্যাচার করে চলে যাবে?" "হ্যাঁ।" "এটা কোনও মানবিকতার অভিধানে লেখা আছে?" অভিধানের কথা আর তোলার সুযোগ হয়নি। পার্টির নির্দেশে আগে নির্মলদা, রঞ্জিত সহ আশপাশের এলাকা থেকে ৫ জন নেতাকে সরিয়ে নেওয়া হল। অনির্বাণ আর সবিতা বহু খুঁজে ও খবর নিয়ে জানতে পারল না। শুধু এটুকু জানা গেল 'কাজ' হয়ে গেলে ওরা ফিরে আসবে। অনির্বাণ আর সবিতা এই সময়টায় অনেকদিন বাদে একত্রে কাজ করছিল। সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল দু'জন মিলে। যেহেতু পার্টি ওদের সরে যেতে বলেনি ওরা বুঝতে পারছিল না। অথচ পুলিশি অত্যাচারের সামনে ওরা কী করে নির্বিকার থাকবে তাও বুঝতে পারছিল না। কোনও সুনির্দিষ্ট তারিখ ছিল না। ওরা থেকে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। গভীর রাতে একদিন দরজায় আঘাত শুনে চমকে উঠেছিল ওরা। অথচ প্রস্তুত তো ছিলই। কেউ কি পালিয়ে আসবে না? ওদের বাড়ি তো অনেক লোকই চেনে। দরজা খুলতেই দেখে ওদের খুবই পরিচিত কণিকা। ১৭ বছরের নরম কিশোরী। কলোনির মেয়ে। এলোমেলো চুল ও পোশাক নিয়ে দরজায়। "পুলিশ আসতেসে সবিতাদি, খুব মারসে।" ওরা কণিকাকে ঘরে ঢুকিয়ে অনেক সান্ত্বনা দিয়েছিল। তিনদিন। ঠিক তিনদিনে পুলিশ জায়গাটা 'দখলমুক্ত' করেছিল। কলোনির ৮০০ বাসিন্দার মধ্যে মাত্র ছ'জন মারা গেছেন।" শোনা গিয়েছে কিছু মহিলার উপর 'শারীরিক অত্যাচার' করা হয়েছিল। স্থানীয় কয়েকজন মানুষ ঘটনার প্রতিবাদ করায় তাদের উপরও শারীরিক অত্যাচার করা হয়। তাই দেখে বাকিরা চুপ করে যায়। গোটা ঘটনাটা বাংলায় সাধারণ আলোড়ন তুলতে ব্যর্থ হয়। শুধু সেই অধীর বাগচি তাঁর কলামে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। পার্টি অফিস নতুন করে খোলার পর অনির্বাণ ও সবিতাকে 'প্রতিক্রিয়াশীল'কে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে সাসপেন্ড করার প্রস্তাব করা হয়।

এগারো

বিকেলগুলো থেঁতলানো পাখির দেহের মতো মনে হত। নরম শরীর ও তার উষ্ণতাগুলোকে পিষে দিয়ে চলে গিয়েছে কেউ। মাংস ও কোমল উড়ানপ্রিয় হাড়গুলো শুকনো রক্তে মাখামাখি। পার্টি বেশিদিন সাসপেন্ড করেনি অনির্বাণ ও সবিতাকে। কারণ সবিতা নিঃশর্তে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল। অনির্বাণের সঙ্গে তার আগে বচসা। "তুমি কি পার্টিতে থাকতে চাও না?" "এমন চললে কোনও মানুষ চলতে পারে?" "সারা রজ্যে আর কোনও মানুষ নেই?" "সবাই ভয় পেয়ে আছে।" "সবাইকে ভয় পাওয়ানো এত সহজ?" "সবাইকে যায়নি, তার প্রমাণ অধীরদার লেখাটা", "তোমার অধীরদা এখন বুর্জোয়া কাগজের চাকর।" কথাগুলো গড়িয়ে চলে। নিখুঁত ফুটবল ম্যাচের সেট পিস মুভমেন্ট। পাস থেকে পাসে বল বিপক্ষের জাল লক্ষ্য করে। যেমন পাখির মৃতদেহ বেশিদিন থেঁতলানো অবস্থায় পড়ে থাকে না, রোদ চলাচল গাড়ি তাকে মুছে দেয় তেমনই গোটা রাজ্য চুপচাপ রইল। মুছে গেল উদ্বাস্তু কলোনি লোপাটের মাত্র ছ'জনের মৃত্যু ও 'কিছু' মহিলার নিখোঁজ হওয়া। অনির্বাণ ও সবিতা যে কিশোরীকে আশ্রয় দিয়েছিল সেই রাতে, তাকে পার্টি 'রিহ্যাবিলিটেশন ক্যাম্প'-এ পাঠিয়েছে। অনির্বাণের যাবতীয় অভিযোগ ও ভয়, পার্টির আগ্রাসন ইত্যাদি কেন্দ্রিক, পার্টির কাজের গতির কাছে পরাজিত হচ্ছিল বারবার। অফিসে সংগঠনের কাজ প্রবল গতিতে, এদিকে পার্টি সর্বত্র গড়িয়ে দিচ্ছে নতুন সময়ের স্বপ্ন। পঞ্চায়েত ভোটে বিপুলভাবে পার্টি জিতে প্রমাণ করল উদ্বাস্তু শিবিরের ঘটনা কোনওভাবেই জনজীবনে আঁচ লাগায়নি। সবিতাকে নির্মলদা বেশ জোরের সঙ্গেই জানিয়েছে, যদি এর পরেও অনির্বাণ ফোঁস করে তাহলে বহিষ্কার করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না। সবিতা বাড়ি এসে বোঝাতে থাকে অনির্বাণকে। "দ্যাখ তোমার এই চাকরিটাও তো নির্মলদার করে দেওয়া। আজ এই যে সংগঠন এই যে তোমার এত পরিচিতি সব কিছুর পিছনে পার্টিরই হাত। আর তুমি এখনও... তুমি যদি নতুন করে লিখতে চাও তাহলে পার্টির

কাগজে তোমার জন্য...” অনির্বাণ শুনে যায়। লেখা! অনির্বাণ ছোট করে ফুট কাটে “আমাদের ধর্মহীন পার্টির প্রথম পলিটব্যুরোয় একজন প্রবল শিখ পাগড়ি পরা, কেন?” উত্তর আসে না। সমস্ত জায়গায় এখন শুধু জমি আইন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার জয়গাথা। প্রায় সবাই যখন একবাক্যে মেনে নিয়েছে পার্টি নামক রূপকথার বাস্তবতা তখনও অনির্বাণের মাথায় সেই উদ্বাস্তু কলোনির মেয়েটার মুখ তার ভয়ার্ত চোখ ধাক্কা মারে। উপায় থাকে না। শ্রেয়া বড় হচ্ছে আর বাড়ছে সংযোগ। তার জন্য নতুন বই আর রেকর্ড কেনার মধ্যে দিয়ে একটা ক্ষতশোধন সূত্রল খোঁজে অনির্বাণ। সবিতা এখন হোলটাইমার। গোটা দেশে না হোক গোটা রাজ্যে তো সমবায় হবে। বছর ঘোরার সঙ্গে অনেক কিছু বললালেও আবেগ বদলাল না। কী এক আশ্চর্য কারণে মানুষ প্রবলভাবে সাড়া দিতে লাগল পার্টির ডাকে। সবই ধুতি-পাঞ্জাবি—সবাই কালো ফ্রেমের চশমা। সবিতা শুধুই তাঁতের শাড়ি পরে। যদিও অনির্বাণের মাইনে বেড়েছে ব্যাঙ্কে। শুধু শ্রেয়ার দিকে চেয়ে চেয়ে যখন সেই তাণ্ডবের রাত ভুলতে বসেছে অনির্বাণ ঠিক তখনই বিজন সেতুর নিচে পুড়িয়ে মারা হল কিছু সন্ন্যাসীকে। পার্টির তরফে শুধু নীরবতার নীতি নেওয়া হল। অনির্বাণও চুপ করে গেছে। একটা সময়ের পর কি সবাই চুপ করে যায়। সবিতা বলে “কী হবে কথা বলে? আমরা কি কাজ করছি না?” “কিন্তু এতগুলো লোককে মেরে ফেলা হল দিনের আলোয়?” “তাতে পার্টি কী করবে?” “পার্টি তো সরকার। সে তদন্ত করবে।” “একদল ধর্মীয় উন্মাদের জন্য সরকার নয়।” “কী বলছ তুমি!” আর কোনও কথা চলে না। দলীয় সংগঠনের কাজে অনির্বাণকে বদলি নেওয়ার জন্য জোর দেওয়া হয়। কোনও বাগ্‌বিতণ্ডায় না গিয়ে অনির্বাণ বদলি নেয়। শহর থেকে অনেক দূরের এক গ্রামে। শ্রেয়াকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বারো

এখানে অনুভূতির নাম হলুদ। ব্যাঙ্কের কোয়ার্টারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে হল অনির্বাণের। সদ্য বড় হওয়া দাড়ি আর সাদা পাজামা-পাঞ্জাবিতে। ফর্সা অনির্বাণকে খ্রিস্টান মিশনারি বলেও মনে হতে পারে। ব্যাঙ্কের সংগঠনের পাশাপাশি এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এখনও একটা যে কংগ্রেস ভীতি আছে তার প্রকৃত কারণ খুঁজে দেখাও তার কাজের এলাকাভুক্ত। এমনিতে এই যে জোর করে ট্রান্সফার নেওয়ানো সেটা শাস্তিমূলক, তা বোঝে অনির্বাণ। আসলে তার ফোঁস করা স্বভাব পার্টির পছন্দ নয়। শুধু সবিতার জন্য তাকে বহিষ্কার করা হয়নি। হলেই বা কী হত? মধ্য তিরিশের অনির্বাণ এখানে এসে আবার সাইকেল চালানোর স্বাধীনতা পেয়েছে। যেদিকে দু'চোখ যায় শুধু ফসলের খেত। ভরা। প্রথম কয়েকদিন শুধু অবশ স্নায়ুগুচ্ছ ঘুম চেয়েছিল। তারপর এই দুনিয়ায় শান্তিতে কোথা দিয়ে যে সময় যাচ্ছিল, টের পায়নি সে। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে। সকলে খোঁজ নেয়। কুশল জানে। অনির্বাণের বাবার কথা মনে পড়ে। তাদের ছোট শহরে সবাই চিনত বাবাকে। বাবা পুরোপুরি হারমোনিয়াম নির্ভর হয়ে যাওয়ার আগে অনি নিয়মিত খবর রাখত পাড়ার লোকের। পাড়ার লোকেও বাবার খবর নিত। বাবা শুধু গান নির্ভর হয়ে গিয়েছিল কেন? অনির্বাণ নিজেও কি আজকাল তাই হয়ে যাচ্ছে না? লেখা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তো শুধু রেকর্ডই ছিল বা আছে যা তাকে বাঁচিয়ে রাখে। আজকাল সবিতার প্রতি আর কোনও টান নেই তা সে নিশ্চিত হয়েছে। শ্রেয়ার প্রতি কি টান আছে? বোঝে না সে। এখন এই নভেম্বরের কুয়াশায় ঢেকে থাকা কাটা ফসলের খেত দেখে মনে হয় শুধু গজ কাপড়। ক্ষতের শুশ্রূষা। ঠাণ্ডা। আর এ আরামে তার সঙ্গী তো শ্রেয়ার স্মৃতি নয়। আশ্চর্যভাবে কে সি দে। ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু, ওইখানে থাকো। নয়ানের কাজল বয়ানে লেগেছে লাইনটা এলেই এই তো সামনের কুয়াশা ঢাকা রাস্তাটা—তার কালচে শরীর সে তো সন্ধের দেহে সন্ধের বয়ানে এভাবেই লেপ্টে যায়। আস্তে আস্তে সন্ধে তার কালো গভীরতা খুলে দেয় ঢেকে যায় বাকি সব। অনির্বাণ উদাস হয়ে দেখে। এগুলো কি লেখা যায়? দু'একবার পিন পিছিয়ে একই কীর্তন শোনার পর যখন দ্বিতীয় গানে খসখস করছে তার ফিয়েস্তা পপুলার তার বাবার প্রিয় গান তখন উজ্জ্বল—স্বপন দেখিছে রাধারাণী— কী দরদ দিয়ে গাইত বাবা শেষ শব্দক'টা—বিরহের দেশে বসতি আমার, বঁধু হে অনলেতে বাঁধি ঘর। তাও কি বাঁধা যায়? যারা এই বাঁধন সহ্য করতে পারে না? তারা কি শুধুই সন্ন্যাসী হয়? বাবা কী ছিল? একমাত্র গান ছাড়া আর কিছু তো তাকে বাঁচিয়ে রাখত না। অনির্বাণকেও কি রাখে? শ্রেয়া একটা টান হলেও তেমন তীব্র বিরহ দেয় না আজকাল। অভ্যেস কি এক ধরনের পাথর তৈরি করে দেয়? সিগারেটের মাত্রা বাড়ার সঙ্গে মদও আজকাল টানছে। কিন্তু ভাল লাগছে না। কৃত্রিম আবরণ তাকে এই দুনিয়া থেকে আলাদা করে দিচ্ছে। সেটা তার পছন্দ নয়। শ্রেয়ার প্রতি তীব্রতা নেই কেন? সেটা কি সবিতার প্রতি অনাসক্তি থেকে? মরমে মরিয়া মরালী ডুবিল। আকস্মিক কীর্তনটা থেকে ছিটকে এল একটা লাইন। আর দরজায় আঘাত ঘোর কেটে দিল। “সাবধানে থাকবেন স্যর। আজ ডাকাত আসবে।” চৌকিদারের চেনা গলায় এমন অদ্ভুত কথা শুনে দরজা খুলে দিল অনির্বাণ। “কী বলছ তুমি?” “হ্যাঁ স্যর। আজ পিছনে বড় টর্চের আলো দেখা গেছে।” “তার মানে কী?” “তার মানে ডাকাত পড়বে।” কীভাবে কেটেছিল রাতটা তা অনির্বাণই জানে। স্থানীয় মসজিদ থেকে সবাইকে অস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকতে বলা হচ্ছিল। কোথা দিয়ে ডাকাত এসেছিল তা জানা যায়নি। শোনা গেছিল পাশের গ্রামের তিনজন মারা গেছে। তাতে অনির্বাণ বিচলিত হয়নি। মৃত্যুও আজকাল বিচলিত করে না। কিন্তু অনির্বাণ কেঁপে গিয়েছিল একটা দৃশ্যে। রেকর্ড প্লেয়ারে স্বাভাবিক শচীনদেব বর্মন বাজছে। গোধূলির ছায়াপথে যে গেল চিনি গো তারে। হঠাৎই বারান্দার সামনে সন্ধের মুখের খেতটা একটু বদলে গেল। আশ্চর্যভাবে সেখানে কুয়াশায় মাখামাখিভাবে দাঁড়িয়ে আছে সবিতা। এলোমেলো শাড়ি। নিশ্চিত হ্যালুসিনেশান। অনির্বাণ উঠে এগিয়ে যায়। দোতলার কোয়ার্টার থেকে নামে একতলায়। সামনে তখনও সবিতা দাঁড়িয়ে। “তুমি এখানে?” “কেন আসতে নেই?” “না বলে...” “আমার স্বামীর কাছে আসতে অনুমতি নিতে হবে?” “না... মানে...” “তুমি এসো আমার সঙ্গে।” অদ্ভুত লাস্যে মাখামাখি হয়ে সবিতা ডাকছে অনির্বাণকে। “কোথায়?” “আরে এসো না...” বলে হাত ধরে টান মারে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অনির্বাণ খানিকটা এগোতেই দেখে খেতের একপাশে বেশ কিছু বইপত্র। পাশে একটা ছোট্ট গ্রামোফোন। তাতে প্লাস্টিকের খেলনা রেকর্ড। শচীনদেব বর্মনের একটা লং প্লে রেকর্ডের খাপ। ভিতরটা ফাঁকা। এই ফাঁকা রেকর্ডটাই সংবিত ফেরায় অনির্বাণের। আশপাশে কেউ নেই। অনির্বাণ দাঁড়িয়ে আছে তার পরিচিত মেঠো রাস্তাটায়। হাতে ধরা আছে নিজেরই লং প্লে রেকর্ডের ফাঁকা খাপ।

এই ঘটনার চারদিন পর অনির্বাণ এক ইনল্যান্ড লেটার পায়। “ভাই, মা মারা গেছে গত সপ্তাহে। পাঁচ তারিখ। তোর ঠিকানা অনেক কষ্টে সবিতার কাছ থেকে জোগাড় করেছি। বড়দা শ্রাদ্ধ করছে ঘটা করে। তুই তো এখন এসব মানিস না, তবুও জানিয়ে রাখলাম। মা যাবার আগে বার দুই তোর কথা বলেছে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে তোর উপস্থিতি আমাদের প্রত্যেকের কাছে কাঙ্ক্ষিত। আশীর্বাদিকা বড়দি।”

একঝলক আঘাত মনে হলেও পরমুহূর্তেই সব নরম হয়ে গেল। এক আশ্চর্য সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে অনির্বাণ। কিছুই ইচ্ছে করে না। শুধু গান শোনা আর যন্ত্রের মতো করে যাওয়া। সংগঠনের কাজ। সংগঠনের দায় বেশি থাকায় সহকর্মীরা তাকে সমীহ করে। অন্য কাজ কম দেওয়া হয় তাকে। অনির্বাণ

ব্যাপারটা পছন্দও করে। আগে ভাবত অনেক কিছু এখন আর বিচলিত হয় না সে। এক আলস্য তার ডানা তাকে ঢেকে বসে থাকে বিরাট পাখির মতো। তার উত্তাপে সে বিভোর হয়ে থাকে। তবে মাঝে মাঝে না লেখার ইচ্ছেটা জানান দেয়। খাতা-কলম নিয়ে বসেও আজকাল। সাদা কাগজ আর না খোলা কলম তার টেবিলের নিত্য দৃশ্য। শুধু রেকর্ড আর গান। অফিসের নিচুতলার কর্মীরা গানবাবু নামও দিয়েছে। অদ্ভুতভাবে কোনও শরীরী চাহিদাও অনুভূত হয় না। অনির্বাণ বেঁচে আছে তো? ওই গ্রামে এসে জীবন ও মৃত্যুর যাবতীয় একরৈখিক ধারণা ভেঙে গিয়েছে। এই তো সেদিন তারই ব্যাঙ্কের কর্মী পুলিনের মেয়েকে না কি ভূতে ধরল। সবাই দেখতে গেল তার ভূত ঝাড়ানো। পুলিন যদিও তাদের সংগঠনের কর্মী তবুও যুক্তিবাদ তার গায়ে একটুও আঁচড় কাটেনি। সন্ধে হলে সবাই বিশ্বাস করে অপদেবতার উপদ্রব শুরু হবে। সে দলের সাংস্কৃতিক শাখাকে লিখেছে এখানে কিছু বিজ্ঞান সচেতনতা অনুষ্ঠান করতে। উত্তরও এসেছে। লোক আসবে। তবে ভিত্তিমূল নড়ে গেছিল গ্রামগুলোকে ঘুরে দেখতে গিয়ে। প্রায় বিভূতিভূষণের আরণ্যকের চেহারা। সে বিস্মিত হলেও একলাইনও লেখেনি। কে লিখছে এখন? চারপাশ কেমন যেন স্থির ও চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। পার্টি যাতে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে, তার জন্য তার গণসংগঠনগুলো তেড়ে কাজ করা শুরু করেছে। মনে হয় তারাই শুধু সক্রিয়। এ বছরের সবক'টা পুজো সংখ্যা আনিয়েছে সে। অধীর বাগচির উপন্যাসটা ছাড়া বাকি কোনও লেখাই কি দাগ কেটেছে? কেন? সবাই কি খুব ভাল আছে?

অনির্বাণ জানে এখনকার সমস্ত প্রতিষ্ঠিত লেখকই পার্টির লেখক সমবায়ের সদস্য। যদিও সমকাল গোষ্ঠী ভীষণভাবে পার্টিবিরোধী, অন্তত ওপর ওপর তবুও তাদের লেখকরা অদ্ভুতভাবে এক, শুধু মধ্যবিত্ত দুনিয়ায় পাক খাচ্ছে। আর অন্যদিকে? পার্টি সদস্য এক বড় লেখক নদীর পাড় ও তাতে নির্ভর করে থাকা লোকেদের নিয়ে একটা বিরাট উপন্যাস লিখে খুব নাম করেছে। এটা নির্মলদারা পার্টির সমস্ত সাংস্কৃতিক বা সংস্কৃতিমনস্ক লোকজনের পাঠ্যপুস্তক করে দিয়েছে। ভাল লেগেছে। অনির্বাণের পছন্দ হয়েছে এই বাস্তব চিত্র। এটাই তো দেশ। আস্তে আস্তে রাজ্যটা গোটা দেশের মধ্যে এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মতো থাকবে। এটাই তো স্বপ্ন। নির্মলদা একটা চিঠিতে লিখেছে অনির্বাণকে— প্রস্তুত হ, যে স্বপ্নের রাজ্যে আমরা যেতে চাই, তার বীজ পোঁতা হয়েছে। তুই এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাবি এখন। এটাকে কাজে লাগা। লেখ নতুন করে। তুই না লেখক হতে চেয়েছিলি? সে তো এখনও চায় সে। কিন্তু হয় না কেন? মা, দিদি-দাদা যাকেই একবার ছেড়ে চলে এসেছে সে তাদের জন্য আর কোনও টান অবশিষ্ট থাকেনি। কেন? পশুমাতা যেভাবে তার সন্তানকে চাটে সেভাবে মাঝে মাঝে উসকে ওঠা স্মৃতিকে চাটা ছাড়া আর কিছু নেই। এমনকী আশ্চর্যভাবে সবিতা আর শ্রেয়াকেও আর অপরিহার্য মনে হয় না। দিব্যি থাকা যায় ওদের ছাড়া। যাচ্ছে। কেন? সে কিসের অপেক্ষায় বেঁচে আছে? ইপি রেকর্ডে বাজা বেগম আখতার ছাড়া আর কোনও শব্দ আসে না।

তেরো

পশু তবু চাটতে গিয়ে মাঝে শিশুর লোমের ফাঁকে মাংস খুঁজে পায়। স্মৃতিতে তা যায় না। স্মৃতি একটানা ফায়ারিং স্কোয়াডের দেওয়ালের মতো, একটানা মিলিটারি মার্চের মতো। একঘেয়ে। সবিতাকে বলতেই খ্যাঁক করে উঠল সে। "তোমার একঘেয়ে হতে পারে আমার নয়।" "তোমার স্মৃতি তাকে জড়ানো আবেগ একঘেয়ে মনে হয় না?" "না। তোমার হয় কারণ তুমি স্মৃতিও তৈরি করতে পারনি" "স্মৃতিও মানে তুমি কী বলতে চাইছ? আমি আর কী তৈরি করতে পারিনি?" "তুমি কী তৈরি করতে পেরেছ।" "মানে?" "তুমি নিজেই বল তুমি কী তৈরি করে পেরেছ। পারনি।" "সংসারটা তো তুমিও পারনি।" "তার পিছনে কারণ ছিল।" "হাঃ কারণ! পার্টি তোমার কাছে সব। আমি বা শ্রেয়া..." "নিজের দিকে তাকাও একবার অনি। তুমি আমাকে স্ত্রী হিসাবে কী দিয়েছ?" "কী চেয়েছ তুমি?" "হায় রে তা যদি বুঝতে। তুমি না পেরেছ লিখতে, না পেরেছ সংসার, এমনকী পার্টি... তোমার মতো বিলো অ্যাভারেজ লোক কিস্যু পারে না" অনির্বাণ চোয়াল শক্ত করে শুনেছিল কথাগুলো। কিন্তু কোনও উত্তর দিতে পারেনি। পারেনি না চায়নি? কী উত্তরই বা দিত? একমাত্র শচীনদেবের লং প্লে আর পান্নালালের ইপি এই তো তার ভাল লাগা। পান্নালালের জন্য পার্টিতে কথা কম শুনেছে সে। তবুও তো সে ছাড়েনি। এখন সঙ্গে জুড়েছে শম্ভু মিত্রের আবৃত্তি করা জীবনানন্দ। ওই নেশা ধরানো গলায় বধূ শুয়ে ছিল পাশে, শিশুটিও ছিল/প্রেম ছিল, আশা ছিল, জ্যোৎস্নায়—তবে সে দেখিল/কোন ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার? কিন্তু কী আছে এই ডাকের মধ্যে? শম্ভু মিত্রের গলার মধ্যে? শব্দগুলোর মধ্যে? অনির্বাণ অর্থ পায় না। একটা জড়ভরত; একটা মনখারাপের ডেলা হয়ে বসে থাকে সকালগুলো। সেই গ্রাম থেকে ফিরে আসার পরে কেমন যেন সব পাথর হয়ে গিয়েছে আরও। বধির। সে কি নিজেও তাই নয়? সেই স্বরলিপি আবিষ্কার করা থেকে সবিতার হাত স্পর্শ করা অবধি তো শব্দ ছিল। অন্যান্য ধ্বনি ছিল। তারপর? বাবার কথা মনে হয়। শুধু সুর আর নির্দিষ্ট গায়ক তালিকা। এর বাইরে আর কিছু বেঁচে নেই। প্রতিদিন এই যে তিলতিল করে সুরের ভিতরে নিজেকে চালান করে দেওয়া একে কি মৃত্যু বলে? সে তো নিজে গাইতেও পারে না। 'পারা' শব্দটার প্রতি আক্রোশ জন্মায়। বালিশে আঁচড়ায়। এই সেদিন শ্রেয়ার একটা ধাঁধার উত্তর না দিতে পারায় সে মুখের উপর বলেছিল "বাবা তুমি কী বোকা!" সবিতা ধমকে সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিলেও সে নিজে বোঝে। সত্যিই তো গত ১৫/১৬ বছর ধরে ব্যাকরণ না জানা সুরের ভিতরে নিজেকে গুঁজে দেওয়া ছাড়া আর সে কী করেছে? একটা নদীর পাড় ভাঙার স্বপ্ন প্রায়শই এসে আঘাত করে মাথায়। বারবার অনির্বাণ কাদায় পা দেয় আর নদী গিলে নেয় পাড়। হাসি পায়। ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু কিছুই হয় না। একটা ডেলা হয়ে যাওয়া পুরুষ রোজ অফিস যায়, সামান্য কাজ করে, ইউনিয়ন করে না আজকাল—লোকে পাগল হয়ে গেছে বলে কোণঠাসা করেছে—বাড়ি ফিরে শুধু রেকর্ড বাজায় আর সিগারেট খায়। আর নিজের জন্মবার শুক্রবার নিয়ম করে শম্ভু মিত্রের আবৃত্তিতে জীবনানন্দ শোনে। সবিতা এখন বেশ জাঁদরেল নেত্রী। শ্রেয়া হোস্টেলেই আছে। এখন কিশোরী। সবাই ধরে নিয়েছে অনির্বাণ পাগল হয়ে যাচ্ছে বা গেছে। শুধু এখনও জামাকাপড় সুস্থভাবে পরে, লোকের সঙ্গে কথা ঠিক বলে তাই হাসপাতালে দেওয়া হয় না। রঞ্জিত তো সবিতাকে বলেই দিয়েছিল 'পার্টির রমরমা দশায় যে পার্টি ছেড়ে দেয় তাকে ডাক্তার দেখানো উচিত।" সবিতা তা করেনি। সে বোঝে অনির্বাণের কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু ঠিক কী ঘটলে মানুষ পাথর হয়ে যায়? অনির্বাণকে এই প্রশ্ন করলে হেঁয়ালি করে। বলে "ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?" উত্তর হয় না এ কথার। সবিতা শুয়ে পড়ে।

অফিস থেকে ফিরে সেদিন অনির্বাণ অতুলপ্রসাদী শুনছিল। কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়। যদি তোর হৃদয়যমুনা। সিগারেটটা আজ যে কোনও কারণেই হোক কম খাওয়া হয়েছে। তবে তুই এ কূল ও কূল ভাসিয়ে দিয়ে চল রে ভোলা লাইনটা শরীরে কেমন একটা উত্তেজনা তৈরি করল। বর্ষার সদ্য তীব্র বৃষ্টি হয়ে যাওয়া বিকেল। অনির্বাণ হঠাৎই বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যে কোনও কারণেই হোক আজ বাড়িতে সবিতাকে খুব মনে পড়ছিল। অনেকদিন পরে তার সবিতাকে স্পর্শ করতে ইচ্ছে করছিল। অনির্বাণ জানত যে তাকে একমাত্র পার্টি অফিসেই

পাওয়া সম্ভব। সাইকেল বের করে দীর্ঘদিন বাদে এই সময় বিশেদার দোকানের দিকে পেডাল চালাল। কিন্তু সেখানে পৌঁছে খেয়াল হল এখন তো পার্টির নিজের বাড়ি হয়েছে। স্থানীয় সমস্ত ব্যবসায়ী চাঁদা দিয়েছে বাড়িটা তৈরি করার জন্য। কী মনে করে বিশেদার সঙ্গে একটু কুশল বিনিময় করতে নেমে পড়ল অনির্বাণ। সেই একই স্পিরিটে হিন্দি গান চলছে। শুধু বিশেদার চেহারাটা একটু ক্ষয়ে গিয়েছে। সাধারণ কথাবার্তায় শুধু এটুকুই উঠে এল নির্মলদা কেমন নাকি বদলে গেছে। পার্টি অফিসে গেলেও দেখা করতে চায় না। এই সব নানা অভিযোগের মাঝে এও শুনতে হল অনির্বাণ নিজে কেন আসে না। আজ অনেকদিন বাদে যেন সব কথার উত্তর দিতে ইচ্ছে করছে। ভাল লাগছে, বাবা বলত এই সময়টা রাগ হংসধ্বনির। সময় পেরিয়ে গেলে কী হয়? সামান্য উদাস ভাললাগাটা আছে। সাইকেলটা নিয়ে সে ধীর লয়ে পার্টি অফিসের দিকে অগ্রসর হয়। অনেকদিন আসা হয়নি এই দিকটায়। অজস্র বাড়ি হয়েছে নতুন। একটা পার্কও হয়েছে। একটু থামল অনির্বাণ। এখন তো আর আগের মতো প্রবল তাড়া নেই। সবিতা থাকবে পার্টি অফিসে। দেখা করা যাবে। তাকে দেখে চমকালেও ভাল লাগবে সবিতার। মনে হয় অনির্বাণের। পার্কটায় বর্ষাজনিত আগাছা ভরে আছে। কিছু জায়গায় দামাল পায়ে চষা ঘাস। কোনওদিন কোনও পার্কে ফুটবল খেলেছে বলে মনে পড়ল না। সে একটা সিগারেট ধরাল। নিশ্চিত টানে আত্মবিশ্বাসী সিগারেট শেষ করল সাত মিনিটে। কিন্তু পার্টি অফিসের সামনে পৌঁছে একটু দমেই গেল। সামনে মোটে দুটো চটি খোলা। ভেবেছিল আরও অনেক লোক থাকবে। বেশ জমাটি আড্ডা হবে। পাশে সাইকেলটা রেখে দরজায় আঘাত করতে টের পেল সেটা ভিতর থেকে বন্ধ। একটু অবাক লাগল। বাইরের খোলা চটির একটা মেয়েদের, অন্যটা পুরুষের। অনির্বাণ সবিতার চটি চেনে না। তাই আত্মবিশ্বাস কেমন কমে গেল। কে জানে হয়তো কোনও তরুণ যুগল প্রেম করছে। এই ভেবে পিছিয়ে এসে যখন সাইকেলটা নিতে এগোচ্ছে, তখনই দরজাটা খুলে গেল। রঞ্জিত আর সবিতা। সবিতার মাথার চুল খোলা। রঞ্জিতের জামার বোতাম খোলা। দু'জনেই অনির্বাণকে দেখে একসঙ্গে চমকে বলল—একি তুই/তুমি!

চোদ্দো

সূর্যাস্তের আলো পড়লে বাড়িটাকে মনে হয় সোনাঝুরি গাছে মুড়ে রাখা। সামনে অনেক গাছ। আম জামরুল কদম বাতাবিলেবু শিমুল। ভারত যখন গ্যাট চুক্তিতে সই করছিল, মুক্ত হচ্ছিল দুনিয়ার বুকে তখন অনির্বাণ জীবনে হয়তো শেষবারের মতো গান ছাড়া অন্য কোনও জিনিসে সাড়া দিয়েছিল। রঞ্জিত আর সবিতার প্রেমজ বা দেহজ সম্পর্ক টের পাওয়ার পর সে আর তাদের ভাড়া বাড়িতে থাকেনি। তিনদিনের মধ্যে এই গাছে ঢাকা বাড়িটা আবিষ্কার করে নিয়েছিল। কোনও কথা বলেনি সে। সবিতা তাকে বলেছিল "তুমি যা দেখেছ তা ঠিক নয়, তুমি ভুল বুঝেছ"—ইত্যাদি কথা। অনির্বাণ উত্তর দেয়নি। যেমন দেয়নি পূর্ব ইউরোপের পতনে পার্টির দ্বন্দ্বে। কেন দেবে সে? বুঝতে বা নিজেকে বোঝাতে পারেনি। অনেক সিগারেট আর সতীনাথ মুখোপাধ্যায় নিয়ে সে ডুবে ছিল। বনের পাখি গায় বোলো না বোলো না। পার্টি বহিষ্কার করেছিল খাতায়-কলমে নিয়ম মেনে। সবিতা যখন প্রবল ধিক্কারে তাকে ভরিয়ে দিচ্ছিল তখন শুধু কে গো গাগরি ভরণে যায় ছাড়া আর কোনও শব্দ কানে যায়নি। সামনে তখন নভেম্বরের কুয়াশা আর জ্যোৎস্নায় মাখামাখি রাস্তাটা একটানা ঠাণ্ডা অ্যালুমিনিয়ামের স্রোতের মতো মনে হচ্ছে। আর তার উপর সাইকেল, তার উপর আলো-আঁধারির ছোট শহর। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে কুয়াশার রিবন নেমে আসছে আহ্ ঠান্ডা ঠান্ডা... অনির্বাণ সাইকেল থামায় বহুদিনের পরিচিত খাল পাড়ে। এখানেই সে আবিষ্কার করেছিল সন্ধে, বিকেল, সবিতা... আজ শুধু মাথার ভিতরে সতীনাথ। এখন আর রেকর্ড চলে না। তার বদলে ক্যাসেট। সেই গ্রুভ গোনার শব্দ নেই। তার ফিয়েস্তা পপুলার এখন খুব কষ্ট করে আওয়াজ করে। অনির্বাণ শিখে নিয়েছিল রেকর্ড প্লেয়ার সারানোর কাজও। কিন্তু এখন কাজে লাগে না। ক্যাসেটে সেই স্বাধীনতা কই। এই তো সতীনাথ, আমি তো দেখেছি মধু বসন্তে মরা ফুল আছে পড়ে লাইনটায়, মধু বসন্তে পৌঁছনোর পর গ্রুভে ময়লা পড়তই। মরা ফুল আসার আগে একটু বেশি খসখস শব্দ হত। পাষাণের বুকে নাম লেখার আকুলতা কি তাতে একটু বেশি হত না। যতবার মুছেছে সে ধুলো সেখানেই জমেছে। এই কথোপথন সম্পর্ক ক্যাসেটে কোথায়? সেজদির অনেকগুলো ক্যাসেট বেরিয়েছে, সে দেখেছে। কিন্তু কেনেনি। ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে শ্রেয়াকে দেখতে ইচ্ছে করে। দেখে। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে আর রাধিকা বিহনে কাঁদে রাধিকার মন মনে পড়ে। কার বিহনে কাঁদে সে? কাঁদে কি? রাস্তায় সাইকেল চালালে মনে হয় পাশ থেকে লোকে টিটকিরি দিচ্ছে 'পারে না। দুয়ো। পারে না!' কিন্তু দেয় না। সে মান্য নেত্রী সবিতার স্বামী। কিন্তু সে দেখে বেশ কিছু দেওয়ালে সবিতার হাতের লেখার পোস্টার মারা 'পারে না'। যে দিন সে স্পষ্ট দেখেছিল প্রথমবার সে পোস্টার, রাতে এক অদ্ভুত মোহে সে সবিতার বুকে মাথা রেখেছিল। ঠান্ডা পাথরে মাথা রাখা। আর তার সঙ্গে সবিতার প্রত্যাখ্যানসূচক শব্দ। যদিও কানে যায়নি রাস্তায় নিরীহ কুকুরের পেটে কেউ লাথি মারায়। অনির্বাণ ছিটকে উঠেছিল। আর এই ঘটনার দু'বছরের মধ্যে সে আবিষ্কার করে নিয়েছিল সবিতা ও রঞ্জিতকে। আর তার নতুন বাড়িকে। সবিতা বলেছিল। কানে যায়নি। শুধু আহত নিরীহ পশুর আর্তনাদে ভরে ছিল মাথা। এই বাড়িটার দেখা পেতে মনে হয়েছিল এই সেই ছায়া। এই জমাট শীতলতার ডেলা যেখানে নিশ্চিন্তে গানের দেহে মাথা গুঁজে দেওয়া যায়। তাই তো দিত অনির্বাণ। তাই তো দেয়। অফিস। চাকরি। আর ফিরে এসে গান। কী আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সে নিজের গলা দিয়ে গান বের করে আনার। শুধু ফাঁপা আওয়াজ। শুধু একদিন সতীনাথের ইপি রেকর্ড বাজানোর সময় সে কেঁদে ফেলেছিল। অনেকক্ষণ তেল ইত্যাদি দিয়ে রেকর্ড প্লেয়ারটাকে সচল করার পর খেয়াল হয়েছিল বাইরে তখন বর্ষার বিকেল। সেই রং চুঁইয়ে নামছে একা থাকার বারান্দায়। ঠান্ডা বাতাস। শনিবার। নির্বান্ধব; সে তো অভ্যেস। ফ্লাস্কে চা করে রাখে সে। চা ও সিগারেট সমেত যখন সে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসল তখন পাশে ফিয়েস্তা পপুলার বাষ্প উগরে দিচ্ছে বুকে। সামান্য বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। সতীনাথ সবে এ জীবনে যেন আর কিছু ভাল লাগে না, আজ তুমি নেই বলে। খসখস শব্দহীন গ্রুভে তখন মেঘলা বিকেল শীতল। অনির্বাণ স্পষ্ট দেখতে পেল বাবা মারা যাবার পরের একটা সন্ধে। পাথর হয়ে যাওয়া মা রেডিও শুনছে। এই গানটা বাজছে আর সেভাবে শুকনো শিবলিঙ্গের তলায় হঠাৎ পাওয়া যায় গত পুজোর ফল, সেভাবে ভিজে উঠছে বালিশ। নিঃশব্দে। অনির্বাণও কোনও কথা বলেনি। বিশ্বাস করত কেঁদে নিতে পারলে বুঝি আর কোনও কথা বলতে হয় না। ভুল বুঝত সে। পরে টের পেয়েছে। কতবার তো সে মনে মনে তীব্র চিৎকার করে উঠেছে কান্নায়। উথাল-পাথাল অশ্রুতে ভেসে গিয়েছে দুঃখের শিকড়। কী হয়েছে তাতে? দুঃখের ভেজা অঞ্চল শুকোতে যে তীব্র বাতাস লাগে তা কোথায়? শুধু কপালে অশ্বক্ষুর আর নাসার দু'পাশে অশ্রুরেখা। শুকনো বালিতে সাপের চলন। শুধু গান। আর সুরের চলন ছাড়া তাতে মাথা নাড়ানো ছাড়া আর কী আছে? এই বাড়িটা ভাল লাগে অনির্বাণের। দোতলা সাদাটে ক্রিম রঙের। একতলায় দুটো ঘর। রান্নাঘর। সামনে গ্রিল দিয়ে ঘেরা বারান্দা। দোতলাটা বাড়িওয়ালার। কিন্তু তাঁরা থাকেন না।

গোটা বাড়িটার শীতলতা ভোগ করে একা অনির্বাণ আর তার শোনার গান। দরজা দিয়ে নেমে এলে মোরাম বিছানো পথ। দু'পাশে ঝাঁকড়া গাছ। বর্ষার ঘন মেঘ দুপুরে দেখলে মনে হয় তেজি গাছগুলো থেকে অ্যাক্রিলিক গাঢ় সবুজ ঝরে পড়ছে। অনির্বাণ উঠে গিয়েছিল সেদিন। মায়ের সেই নিঃশব্দ অশ্রুর পাশে নিজের শুকনো কান্নাকে রেখেছিল সে। কান্না ভাবলেই মনে হয় মরুভূমির মধ্যে দিয়ে সাপ যাচ্ছে। বিশেদা বলেছিল কেঁদে লাভ নেই রে। কেউ শোনে না। বিশেদা তখন হিন্দি গান শোনা ছেড়ে শুধু লোকগীতি শোনে। তার বড় মেয়েটা বাচ্চা হতে গিয়ে মারা গিয়েছে। অনির্বাণ উঠে দীর্ঘদিন পর চেয়ার-টেবিলে বসেছিল। তার চেয়ার-টেবিলে খাতা-কলম-বই গোছানো আছে। শুধু লেখা হয়নি এতদিন। দীর্ঘদিন বাদে দেখা হওয়া প্রেমিকার উপর আছড়ে পড়েছিল সেদিন। চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিয়েছিল মুখ, স্তন। খোলা চুল প্রথম প্রেমিকার সামনে সে কী আকুলতা! কিন্তু কিছু হয়নি। সময়ে পুজো না পেলে যে কোনও মনসাই চাঁদ সদাগরের উপর খেপে যায়। কোনও শরীরই অপেক্ষা করে না। পাথর। অনির্বাণ যখন চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে তখন টেবিলের পায়ের কাছে অনেক ছেঁড়া পাতা। সামনে খোলা খাতাটাও শূন্য। পিছনে কোনও গান বাজছে না।

পনেরো

চৈত্র বিকেলের ঝাঁঝে মনে হল প্রথমবার উঠোনের শিমূল গাছটাকে দেখল এভাবে। ন্যাড়া গাছটার প্রতিটা ডালে থকথক করছে লাল নরম ডেলা। প্রতিদিনই তো দেখে সে। নিজের বয়সের মতো। এই তো বছরখানেক আগে নিজের পৈতৃক ভিটে বিক্রি হওয়ার সময় সে বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল একটা ছোটবেলার ছবি। অনির্বাণ একেবারে শিশু। একটা গাছের গুঁড়ির পাশে। গাছ বা এলাকাটা সে চিনতে পারে না। কিন্তু অদ্ভুত কিছু ছবি ঝাপটা মারতে থাকে। দুটো বাচ্চা। পুরুষ। মাটি দিয়ে একটা ছোট চৌকো আকার দাঁড় করিয়েছে বাড়ির উঠোনে। খুবই ছোট্ট। কোথা থেকে যেন সেই দ্বিতীয় বাচ্চাটা একটা নিকষ নীলচে পাথর এনেছে। খুব কাছ থেকে দেখলে সেই পাতলা স্লেটের মতো পাথুরে পাতের গায়ে সবুজ আভা দেখা যাচ্ছে। ছোট অনির্বাণ বন্ধুর হাত থেকে (রঞ্জিত?) পাথরটা নিয়ে ছোট বাড়িটায় ছাদে চাপিয়ে দিল। আর মুহূর্তে মাটির বাড়িটার খড় পচা রঙের উপরে নীলচে সবুজ পাত এক ম্যাজিক তৈরি করল। কী আশ্চর্য রং আর তার ভাঙা ভাঙা দেহসৌষ্ঠব। অনির্বাণ প্রথমতম বার যেদিন এই উঠোনের শিমূল গাছটাকে আবিষ্কার করেছিল চৈত্র মাসে, সেদিনও আশ্চর্যভাবে একা একা খেলছিল সে কিছু স্টেপলারের পিনকে বাক্স থেকে বের করে সাজাচ্ছিল টেবিলের উপর। ট্রেন। আর সেদিনও ঝাপটা মারছিল ছোটবেলার ঘটনা। কিন্তু যেদিন শিমূল গাছটার ভরা পাতা দশা আর ছোটবেলার ছবি একত্র হল সেদিন থেকে পাথর তাড়া করে বেড়াচ্ছে অনির্বাণকে। পিছনে শান্তিদেব ঘোষের একটা এলপি বাজে। বেগুনি কভার। খালি গলায় গাওয়া কিছু বসন্তের ও পুজো পর্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত। বিশেষত এই চৈত্রের দুপুর কামড়ানো বিকেলবেলা। এইসব অশেষ দুপুরগুলো ফাঁকা লাগে। কেউ নেই আশপাশে। শুধু শান্তিদেবের গান, বেগুনি মলাট, ন্যাড়া শিমূল গাছ আর অজস্র বাচ্চাদের স্লেট। অনির্বাণ ভাঙে আর শিমূল গাছটার তলায় ফেলে দেয়। গাছের তলাটা এখন নানা মাপে স্লেটের টুকরোয় ভরা। দূর থেকে দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়। চৈত্রের লকলকে আকাশ তার তলায় ন্যাড়া শিমূল গাছ তার ভাঙা পাথরের শিকড়গুচ্ছ। চয়ের কাপ হাতে অনির্বাণ নামে। পিছনে তখন স্বপ্ন তারে জমল বোঝা, চিরজীবন শূন্য খোঁজা। শান্তিদেব। অনির্বাণ হাতে একটা ভাঙা স্লেটের টুকরো নিয়ে দেখছে।

একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগায় হঠাৎ টের পেল প্রথম কালবৈশাখী আসছে। আজ ভিজবে অনির্বাণ। কপালে কিছু ঘামাচি বেরিয়েছে। একটা সিগারেট ধরাতে যখন সার্বিক ভাললাগা লতিয়ে উঠছে তখন গাছটা থেকে প্রায় ৪০ মিটার দূরের গেটটা খুলে একটি সালোয়ার কামিজ পরা মেয়ে ঢুকে এল মনে হল। অনির্বাণের চশমা নেই চোখে। এগিয়ে আসছে সেই অচেনা মেয়ে। গাছটার তলায় ভাঙা স্লেট হাতে গাছে ঠেস দিয়ে বসে থাকা অনির্বাণকে এক সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা বিধ্বস্ত সৈন্য বলে মনে হচ্ছে। পরিষ্কার করে কামানো দাড়ি গোঁফ। শুধু চুলগুলো বড়। তার দীর্ঘ রোগা চেহারাটাকে কেমন যেন তীক্ষ্ণ অথচ লক্ষ্যভেদ করতে ব্যর্থ জ্যামুক্ত তিরের মতো মনে হচ্ছে। মেয়েটা সোজা এগিয়ে এসে অনির্বাণের ফ্যালফ্যালে দৃষ্টির সামনে দিয়েই পাশে ঝুঁকে পড়ল। কথাশূন্য অনির্বাণের মাথার চুল হাত দিয়ে এলোমেলো করে দিল। সদ্য তরুণী। সুঠাম গঠন। মেদহীন। তীক্ষ্ণ। অনির্বাণ অবাক হয়ে প্রশ্ন করার আগেই মেয়েটা বলল, "বাবা এটা কার গলা?" পিছনে তখন শান্তিদেব চৈত্ররজনী আজ বসে আছি একা, পুনঃ বুঝি দিল দেখা/বনে বনে তব লেখনীলীলার রেখা/নবকিশলয়ে গো কোন ভুলে এল ভুলি তোমার পুরনো আখরগুলি। অনির্বাণের বিস্ময় তখনও কাটেনি। আকাশ থেকে একটা দুটো ফোঁটা পড়ছে। "শান্তিদেব ঘোষ।" "শান্তিদেব ঘোষের কথা তো শুনিনি কোনওদিন। তুমি কোথায় পেলে?" অবাক করা সাবলীলতায় বিমূঢ় অনির্বাণ বলেই ফেলল, "তুমি এ ঠিকানা কোথায় পেলে।" "তুমি করে বলছ বাবা! আমি শ্রেয়া...।" "তুমি ছাড়া আমায় অন্য কেউ বাবা বলতে পারে বলে মনে হয় না।" "তাহলে আমায় তুমি বলছ কেন?" অনির্বাণ চুপ করে থাকে। "তুমি আমায় গান চেনাবে না?" "কী সব বাজে কথা বলছ? "তুমি আগে আমায় 'তুই' বল তারপর বাকি কথা।" "আমি পারব না।" "আমি কিন্তু চলে যাব তাহলে।" "তুমি এসেছ কেন?" "তোমার সঙ্গে গান শুনব বলে।" "গান একা শুনতে হয়।" "না আমি তোমার সঙ্গে শুনব।" "গান শুনে কী হবে?" "তোমার কী হয়েছে?" "তুমি কি ঝগড়া করতে এসেছ?" শ্রেয়া হঠাৎ অনির্বাণের কপালে একটা স্নেহচুম্বন দিল। যুবতী মেয়ের স্নেহ তার শিশু বাবাকে। "তোমার তলার ঠোঁটটা ফুলে আছে কেন বাবা।" "কী বলছিস তুই।" "হ্যাঁ গো। ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদলে যেমন হয়।" "বাজে কথা।" "হ্যাঁ গো, আয়না আনব?" "না। তুমি গান নিয়ে কী বলছিলে।" "বলব না আমাকে যতক্ষণ না তুই করে বলবে।" "আচ্ছা হয়েছে। এবার বল।" "এই তো। তুমি আমায় গান চেনাবে না?" "আমিই কি চিনি রে!" "তাহলে তুমি কী শোন?" "জানি না।" "তুমি সব জান। আমায় বল।" "তোর মা রাগ করবে।" "জানবে না মা।" "তুই এখানে এলি কী করে।" "একদিন তোমার ফেলে আসা একটা রেকর্ডের খাপ নিয়ে ঘাটছিলাম। উপরে লেখা ছিল শচীনদেব বর্মন। আমি মাকে প্রশ্ন করেছিলাম। মা খেঁকিয়ে উঠল। রেকর্ডটা হাত থেকে কেড়ে ছুড়ে ফেলে দিল।" অনির্বাণ 'ইশ' সূচক একটা শব্দ বের করল মুখ থেকে। "ঠিক তোমারই মতো আমিও চিৎকার করেছিলাম। আর সেটা দেখে মা আরও রেগে গিয়েছিল।" "আর তুই মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করলি?" "না। আমি মার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছি।" "এটা ভাল করিসনি।" "কেন তুমি করনি?" "আমি কী করেছি তুই জানিস?" "না।" "তাহলে?" "তুমি আমায় গান চেনাবে কি না বল।" "তুই এখন জানিস শচীনদেব বর্মন কে?" "না।" আর এই না শব্দটা কেমন যেন কাঁপা কাঁপা শোনাল। অনির্বাণ স্পষ্ট দেখল মেয়েটা কেমন গলে যাচ্ছে। হাত ধরার চেষ্টা করল সে। ধরা গেল না। সারা শরীর জলে ভিজে একাকার হয়ে আছে। প্রবল ঝড় শেষে বৃষ্টি নেমেছে। গাছের তলায় থেমে যাওয়া সুর আর অটোস্টপ খারাপ হয়ে যাওয়া রেকর্ড প্লেয়ারটার ক্রমাগত খসখস সমেত একা অনির্বাণ পাথরের পাশে বসে আছে।